দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-তৃণমূলের নৈরাজ্যের রাজনীতি
— পৃঃ ৭

এবার টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং-এর লক্ষ্য কি উত্তরবঙ্গ ?
— পৃঃ ৪

৭৩ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ২১ ডিসেম্বর ২০২০।। ৫ পৌষ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি

আতঙ্কিত রাজ্যবাসী

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ৫ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২১ ডিসেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৩

এবার টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং-এর লক্ষ্য কি উত্তরবঙ্গ?
▯ সাধন কুমার পাল ▯ ৪

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-তৃণমূলের নৈরাজ্যের রাজনীতি
▯ পুলকনারায়ণ ধর ▯ ৭

দশ বছরেই নাভিশ্বাস : দ্রুত বদলে যাচ্ছে তৃণমূলি পশ্চিমবঙ্গ
▯ সুজিত রায় ▯ ১০

খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মদত দিচ্ছেন সন্ত্রাসে
▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১৩

বহিরাগত তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত বিতর্ক ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ১৪

পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির জন্মদাতা কমিউনিস্টরা
▯ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ▯ ১৬

কৃষি বিল, কৃষক আন্দোলন : বাস্তবতা বনাম ষড়যন্ত্র
▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ১৯

বিজয়ের মাসে পিছন ফিরে তাকাতেই হবে, আত্মত্যাগ ভোলা যাবে না ▯ ২১

নেতাজী সুভাষ, ড. শ্যামাপ্রসাদ ও বীর সাভারকর : এক অন্বয় ব্যতিরেকী সম্পর্ক ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ২৪

যোগতন্দ্রা থেকে উত্তরণের উচ্চস্তরীয় বিজ্ঞান
▯ পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা আচার্য ▯ ২৭

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের প্রকৃত সত্য
▯ ডা: আর এন দাস ▯ ৩০

কলিযুগে অস্মিতা রক্ষার একমাত্র উপায় সঙ্ঘশক্তি
▯ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩৩

মুখ্যমন্ত্রী আদপে বাঙ্গালি কি না সন্দেহ থেকে যায়
▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩৬

লাভ জেহাদের ফাঁদে পা দেওয়ার আগে হিন্দু মেয়েরা ভাবুন
▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ৩৮

উত্তরপ্রদেশে বিয়ের জন্য ধর্ম পরিবর্তন বৈধ নয়
▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৪০

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ▯ ইন্দমতী কাটদরে ▯ ৪১

একুশের ভাষা আন্দোলন : এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ▯ ৪৩

সঙ্ঘে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই
▯ কৌশিক মুখোপাধ্যায় ▯ ৪৫

ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটাই অবান্তর
▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ৪৬

অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন ভারত জেগে উঠছে
▯ অশোক মালিক ▯ ৪৮

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই নৈরাজ্যের অবসান হউক

এক সময় ভারতের নবজাগরণের পীঠস্থান ছিল এই বঙ্গপ্রদেশ। তথাপি দেশভাগের পূর্বে ও পরে উভয় বঙ্গের মানুষ রক্তস্নাত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা শান্তিতে থাকিতে পারিবে। কিন্তু ক্ষমতালোভী স্বার্থপর ও ভোটসর্বস্ব নেতারা রাজ্যবাসীকে শান্তি দিতে পারেন নাই। বাম শক্তির অভ্যুদয়ে রাজ্যে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির সূচনা হয়। ধ্বংসাত্মক রাজনীতিকে তাহারা ক্রমেই খুনের রাজনীতিতে পরিণত করে। ইহা পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট দল রাজ্যে ক্ষমতা দখল করিবার পর। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তাহারা উত্তরোত্তর খতমের রাজনীতি কায়েম রাখিয়াছে। বিরোধীপক্ষের কণ্ঠরোধ ও হত্যালীলায় তাহারা শয়তানকেও হার মানাইয়াছিল। রাজ্যের মানুষ ইহা হইতে মুক্তি চাহিতেছিল। অবশেষে ২০১১ সালে কমিউনিস্টদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিয়া রাজ্যবাসী বর্তমান শাসকদলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

কিন্তু শীঘ্রই রাজ্যবাসীর মোহভঙ্গ ঘটিল। স্বজনপোষণ ও দুর্নীতিতে তাহারা মূর্তিমান হইয়া উঠিল। মানুষ রাস্তায় নামিয়া প্রতিবাদ করিতে শুরু করিল। প্রতিবাদী কণ্ঠ নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য কমিউনিস্টদের চাইতেও আরও ভয়ংকর ভাবে তাহারা রক্তের হোরিখেলা শুরু করিল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তাহারা এইরূপ ১০০ জন প্রতিবাদীকে হত্যা করিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থানে তাহারা আরও ভয়ংকর আচরণ করিতে শুরু করিয়াছে। রাজ্যে গণতন্ত্রের চিহ্ন নাই। দল ও সরকারের মধ্যে কোনো সীমারেখা নাই। পুলিশ-প্রশাসন- আমলা-পার্টি ক্যাডার একাকার হইয়া গিয়াছে। পরিণামে রাজ্যের উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্বত্রই খুনজখম নিত্যদিনের কার্যকলাপ হইয়া উঠিয়াছে। লাশের রাজনীতি শুরু করিয়াছে শাসকদল। নিজেদের পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া নিজেরাই নিজেদের রিপোর্টকার্ড প্রকাশ করিতেছে। গণতন্ত্রে সরকারের কাজের পর্যালোচনা করিয়া থাকেন জনসাধারণ। বিরোধী পক্ষকে তাহারা কোনো ভাবেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। বিরোধীপক্ষের সর্বভারতীয় নেতা রাজ্যে আসিলে বহিরাগত বলিয়া আক্রমণ করা হইতেছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়তো জানেন না যে, গণতন্ত্রে বহিরাগত বলিয়া কোনো শব্দ হয় না। বামেরা এই শব্দ ব্যবহার করিত। এখন তৃণমূল করিতেছে। সত্য সত্যই তাহারা বামেদের সার্থক উত্তরসূরি। বামেদের চাইতেও ইহারা দড়ো।

রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, তৃণমূল দলটির রাজনৈতিক পরিপক্কতা একেবারেই নাই। গণতন্ত্রে দল ও সরকার পৃথক একক। দুয়ের মধ্যে সীমারেখা থাকিতে হয়। এই রাজ্যে আমলারা রাজনৈতিক ভৃত্যে পরিণত হইয়াছেন। রাজ্যের রাজ্যপাল বলিয়াছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মতো দেশে আর কোনো রাজ্য নাই যেইখানে আইএএস, আইপিএস আধিকারিকরা শাসকদলের ভৃত্য হিসাবে কাজ করেন এবং শাসকদলের সর্বপ্রকার দুর্নীতিকে সমর্থন করেন।'

স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের মতো ঐতিহ্যশালী রাজ্যের মানুষ এই নৈরাজ্যকে মানিয়া লইবে না। সেই কারণেই মানুষ পথে নামিয়া মুক্তি চাহিতেছে। আরও শুভ লক্ষণ হইল, শাসকদলের মধ্যে যাহারা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতা রহিয়াছেন তাঁহারাও এই অরাজগতা হইতে রাজ্যকে মুক্ত করিবার মানসে শাসকদল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহারাও প্রকাশ্যে বলিতেছেন, রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া সুশাসন কায়েম করিতেই হইবে। শান্তিকামী মানুষদের পার্শ্বে তাঁহারা দাঁড়াইতেছেন। তাই মানুষ আশায় রহিয়াছেন একুশের নির্বাচনে এই নৈরাজ্যের অবসান হইয়া রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ তাহার হৃতগৌরব ফিরিয়া পাইবে।

সুভাষিতম্

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং
জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।
তে মর্ত্যলোকে ভুবিভারভূতা
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি।।

যার বিদ্যা নেই, তপস্যা নেই, দানের প্রবৃত্তি নেই, জ্ঞান নেই, উত্তম আচরণ নেই, কোনো গুণ নেই এবং ধর্মের প্রতি আস্থা নেই, সে এই মৃত্যুলোকে পৃথিবীর ভারস্বরূপ মনুষ্যরূপে পশুর মতো বিচরণ করে থাকে।

এবার টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং-এর লক্ষ্য কি উত্তরবঙ্গ?

পাহাড় থেকে নেমে ডুয়ার্সে এলেও দেখা যাবে বনবাসীদের একাংশ আসন্ন জনগণনায় হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারনা উপাসনা পদ্ধতির জন্য পৃথক ধর্মীয় কোড চাইছে। এর জন্য পদযাত্রা হচ্ছে, রেল রোকো হচ্ছে। সমতলেও খ্রিস্টান মিশনারিদের সক্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজ রাজবংশীরা হিন্দু সংস্কৃতির অংশ নয় এমন তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হচ্ছে।

সাধন কুমার পাল

পাহাড় কার—বিজেপির না তৃণমূলের? বিমল গুরুংয়ের প্রত্যাবর্তনের ফলে পাহাড়ের রাজনীতির ফসল কার ঘরে উঠবে এটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। অনেক বিশ্লেষককে বলতে শোনা যাচ্ছে রাজ্যভাগের অভিযোগের দায় বিজেপির ঘাড় থেকে মমতা ব্যানার্জি নিজের ঘাড়ে নিয়ে আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিলেন। এতে পাহাড়ে তৃণমূল দুই-একটি আসন পেলেও গোর্খাল্যান্ডের দাবিদারদের সঙ্গে থাকার জন্য সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর আসন হারাবে। তাছাড়া বিমল যে ভাবে মমতার ছত্রছায়ায় থাকা বিনয় তামাং, অনিত থাপাদের দুর্নীতির কথা তুলে ধরছে তাতে পরোক্ষ ভাবে মমতার জমানার দুর্নীতির অভিযোগই মান্যতা পাচ্ছে। এর ফলেও মমতার ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষতি হবে। বিমল প্রত্যাবর্তনের এই সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করে অনেকেই বলছেন তাহলে কি ভোটের পাশা পাল্টাতে 'সারেন্ডার বিমল' নামক বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিলেন মমতা? স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত প্রশ্ন সামনে রেখে এখন সবাই হিসেব করতে ব্যস্ত। রাজনীতি সর্বস্ব সমাজে এই ব্যস্ততা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিতও।

প্রথমে কোনও ব্যক্তির উপর মামলা দেওয়া, এরপর তার উপর চাপ সৃষ্টি করা, তারপর নিজের পার্টিতে তাকে যোগদান করানো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পরিচিত কৌশল নিয়ে সমালোচনাও কম হচ্ছে না। কোচবিহারের গ্রেটার নেতা অনন্ত রায়, জঙ্গলমহলের ছত্রধর মাহাতোকেও একই কৌশলে বাগে আনার চেষ্টা করেছিলেন মমতা। ছত্রধর মাহাতোর ক্ষেত্রে সফল হলেও অনন্ত রায়ের ক্ষেত্রে এখনো সফল হতে পারেননি। বিরোধীদের বাগে আনতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একই কৌশল অবলম্বন করছেন মমতা ব্যানার্জি। ফলে থানাগুলি এখন তৃণমূলের পার্টি অফিসের মতো হয়ে উঠেছে।

বিমল গুরুংয়ের উপর দেড়শোর মতো মামলা করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ। যার মধ্যে ৩০২ ধারায় মামলা, হত্যার চেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা সবই ছিল। গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন করতে গিয়ে ২০১৭ সালের জুন মাস থেকে ফেরার হয়ে যান বিমল গুরুং, রোশন গিরি-সহ মোর্চার জনাকয়েক প্রথম সারির নেতা। সেই সময় গুরুংয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার মামলা-সহ যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক করে নেয় প্রশাসন। জারি হয় লুকআউট নোটিস। বিমল গুরুং বিভিন্ন সময় হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টে জামিনের আবেদন করলেও তা নাকচ হয়ে যায়। অবশেষে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে পাহাড়ে ফেরার পথ প্রশস্ত হয় বিমল-রোশনদের। মমতাকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিতেই পুলিশের চোখ কান সবই বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতা ও প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই হাজার হাজার লোকের জমায়েত করিয়ে শিলিগুড়ির গান্ধী ময়দানে গত ৬ ডিসেম্বর সভা করলেন বিমল গুরুং।

গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরলেন না মোর্চা (জিজেএম) নেতা বিমল গুরুং। তিন বছর অন্তরালে থাকার পর প্রথম প্রকাশ্য সভাতেও তাঁর গলায় শোনা গেল সেই পৃথক রাজ্যের দাবি। শিলিগুড়ির ইন্দিরা গান্ধী ময়দানে আয়োজিত জনসভায় বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে গুরুংয়ের অভিযোগ, 'আমাদের জন্য তিনি কিছুই করেননি। শুধু ভাঁওতা দিয়ে গিয়েছেন। আমরা তাঁদের দলের রাজু বিস্তাকে সাংসদ করেছি। কিন্তু তিনিও কোনও কাজ করেননি। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এখন ভোটে দাঁড়িয়ে জিতে দেখান।' গুরুং আরও বলেন, 'বিজেপিকে কড়া বার্তা দিতেই আমরা বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতাবো। আমরা তৃণমূলকে সমর্থন করব। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যারা আমাদের পৃথক রাজ্যের দাবি মেনে নেবে তাদেরই আমরা সমর্থন করব।' এখন প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি গোর্খাল্যান্ড তৈরি করবেন? রাজনীতির অঙ্গন ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষও এই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। কারণ নতুন রাজনৈতিক সঙ্গী বিমলের মুখে রাজ্য ভাগের হুংকার শোনা গেলেও স্বঘোষিত রাজ্য ভাগের বিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সন্দেহ নেই আগামী দিনগুলিতে এই প্রশ্ন নিয়েও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হাওয়া ক্রমশই গরম হতে থাকবে। প্রশ্ন উঠবে একদিকে বিজেপিকে অবাঙ্গালি পার্টি বলে বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে বাঙ্গালি ভোট, অন্যদিকে গোর্খাল্যান্ডের দাবিদার বিমল গুরুংকে প্রশ্রয়

দিয়ে নেপালি ভোট বাক্সে ভরার পরিকল্পনা! অর্থাৎ গাছেরও খাবেন তলারও কুড়োবেন।

ওই সভায় বিজেপিকে আক্রমণ করে গুরুং বলেন, 'কথা দিয়েও রাখেনি বিজেপি। এর জবাব দিতে হবে একুশের নির্বাচনে। এরপর দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিকে জনসভা করব। আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপিকে উৎখাত করব। জিটিএ-এর অর্থ নয়ছয় হচ্ছে। কীভাবে খরচ হচ্ছে জিটিএর টাকা, তার উত্তর চাই। এর জবাব আমরা বুঝে নেব।' বিজেপিকে উত্তরবঙ্গ থেকে উৎখাতের হুমকিতে এটা স্পষ্ট যে মমতা বিমল গুরুংকে উত্তরবঙ্গজুড়ে, বনবাসী রাজবংশী ও বিভিন্ন জনজাতি এলাকায় বিজেপির ভোট বাক্সে হানা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবেন।

মমতার এই বিপজ্জনক ভোট রাজনীতি যে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টির ইঙ্গিত দিচ্ছে সেই দিকে নজর দেওয়া যাক। প্রথমত মমতা বিনয় তামাংদের সঙ্গে বিমল গুরুংদের এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের সূচনা করে দিলেন। অতীতে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিনয় তামাং ও বিমল গুরুংয়ের মধ্যে পাহাড়ের ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হওয়ার মতো পটভূমি তৈরি হয়েছে। এই আশঙ্কার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও আসতে শুরু করেছে। বিমল গুরুং প্রকাশ্যে আসার পর চুপ করে বসে নেই তাঁর বিরোধী বিনয় তামাং গোষ্ঠীও। একদিকে যেমন কার্শিয়াঙে রোশন গিরির সভাস্থলে পালটা সভা করেছেন বিনয় ঘনিষ্ঠ অনিত থাপা তেমনই পাহাড়বাসীর মন জয় করতে আগেভাগেই জিটিএ এলাকার সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রচার কর্মসূচির জন্য আনা হয়েছে নেপালি ভাষা। আর এবার গুরুং-এর পালটা সভাও করতে চলেছেন বিনয়রা। এর আগে ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন বোর্ড গড়ে এবার বিমল ও বিনয়ের সঙ্গে সম্মুখ সমরের পরিবেশ তৈরি করে মমতা পাহাড়ে যে মুষল পর্বের সূচনা করলেন তার চূড়ান্ত এবং ভয়ংকর পরিণতি দেখার জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর দার্জিলিঙে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতেই ভারত-বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠার লক্ষণ অতীতেও অনেক বার দেখা গেছে। ২০১০ সালের ১৮ আগস্ট এনআইএ কার্শিয়াঙের একটি বাড়ি থেকে মণিপুরি

রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে পাহাড়ে চার্চ-জেহাদি- অতিবাম ককটেলের বিদেশি মদতপুষ্ট টুকরে টুকরে গ্যাঙের কি নতুন খেলা শুরু হতে যাচ্ছে? বিমল গুরুং কি মমতার পাশাপাশি এই গ্যাঙকেও খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে রাজনৈতিক ভাবে পুরুজ্জীবিত হতে চাইছেন?

জঙ্গীগোষ্ঠী কেওয়াইকেএল (Kanglei Yawol Kunna Lup)-এর উঁচুস্তরের দুই জন পদাধিকারী মনজের সিংহ এবং তার স্ত্রী মিনা তামাংকে গ্রেপ্তার করেছিল। সে সময় এনআইএ সূত্র জানিয়ে ছিল যে ওই বছরই মার্চ মাসে মাটিগারা থেকে কেওয়াইকেএল-এর সিনিয়র নেতা নিংথোজাম টোম্বা ওরফে কোইরাং (Ningthoujam Tomba alias Koireng) গ্রেপ্তার হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ-সহ নেপাল, বার্মা ও ভুটানে ওই সংগঠনের জাল বিস্তারের দায়িত্বে ছিল এই মনজের সিংহ।

রাজ্যজুড়ে বাংলাভাষাকে আবশ্যিক করার প্রতিবাদে ২০১৭ সালের জুন মাসে দার্জিলিঙে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অবস্থানের সময় বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে পুলিশের সঙ্গে যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিল তাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছিল। পাহাড়কে শান্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে সেনা চেয়েছিলেন। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন তাতে বলেছিলেন রাজ্য সরকার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে উত্তরপূর্বের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছে। সেজন্য বিমলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী ধারায় মামলাও করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন বাইরের কিছু দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে মোর্চার যা তিনি প্রকাশ্য সভায় খুলে বলতে চান না এবং জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানে দার্জিলিঙে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।

দার্জিলিঙে শুধু সন্ত্রাসবাদী জাল বিস্তারের প্রয়াস নয়, পরিকল্পিত উপায়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে এমন অভিযোগও আছে। অভিযোগ করেছেন খোদ বিমল গুরুং। সে সময় প্রায় এক বছর ধরে বিমল গুরুং গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। সেই গোপন আস্তানা থেকেই ২০১৮ সালের ২৭ এপ্রিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুঙ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে বিমল সরাসরি অভিযোগ করেন পাহাড়ে রোহিঙ্গাদের স্থান দেওয়া হয়েছে এবং পিছনে রয়েছে দার্জিলিং ও পার্শ্ববর্তী জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করার গভীর ষড়যন্ত্র। বিমলের চিঠি প্রকাশ পাওয়ার ক'দিন পর দার্জিলিঙের তৎকালীন বিজেপি সাংসদ এসএস আলুয়ালিয়া পাড়াড়ে রোহিঙ্গাদের

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

করোনা আবহে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য গত কয়েক মাস স্বস্তিকা পত্রিকা মুদ্রণ সম্ভব হয়নি। কষ্ট করে অনেকে অনলাইন স্বস্তিকা পড়তে বাধ্য হয়েছেন। উপযুক্ত মাধ্যম না থাকার কারণে অনলাইন স্বস্তিকাও সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি।

আনন্দের বিষয়, আগামী ৪ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে মুদ্রিত আকারে স্বস্তিকা নিয়মিত প্রকাশ হবে। প্রচার প্রতিনিধি ও গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, বকেয়া টাকা শিঘ্রই স্বস্তিকা কার্যালয়ে জমা দিয়ে নিয়মিতভাবে স্বস্তিকা পাওয়া নিশ্চিত করুন।

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা।

অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। আলুওয়ালিয়া দার্জিলিঙের ভৌগোলিক অবস্থান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং চিকেন নেকের প্রসঙ্গ টেনে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ দেশের পক্ষে কতটা আশঙ্কার তা প্রধানমন্ত্রীকে জানান। আলুওয়ালিয়া চিঠিতে কালিম্পঙের ডেলো, লাভা, মেল্লি ও রংপোতে রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বের অভিযোগ করেন।

গত ৩১ এপ্রিল ২০১৮ এক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। ওই ফরোয়ার্ডেড মেসেজ ক্লিপিংয়ে দেখা গিয়েছিল, শতাধিক মানুষ (স্কাল ক্যাপ পরিহিত) একাধিক বাস থেকে কালিম্পং শহরে নামছে। এরা সবাই রোহিঙ্গা শরণার্থী বলে মেসেজটি ভাইরাল হয়। স্থানীয় মসজিদের ইমাম মাসুদ সুলতান সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেন, 'এরা কেউ রোহিঙ্গা শরণার্থী নয়, ধর্মসংক্রান্ত আলোচনার জন্য সবাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে পাহাড়ে এসেছে।' আরও বলেন যদি কালিম্পং ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের যাতায়াত বেড়ে যায় ধরে নিতে হবে তাঁরা সবাই কাজের খোঁজে এখানে এসেছে।

সে সময় বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে কালিম্পং শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গ-সিকিম সীমান্তে তিস্তার পাড়ে মেল্লি নামে একটি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন যে সমস্ত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল সিকিমে যাওয়ার একমাত্র রাস্তায় তিস্তার ওপরে যে সেতু রয়েছে সেই সেতুটির নীচে বেশ কয়েকটি টিনের ছাউনিতে প্রায় তিরিশটি পরিবার বসবাস করছে। তাদের আদব কায়দা, পোশাক দেখেই স্পষ্ট যে তারা মুসলমান ও দুইএক বছরের মধ্যে তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। সংবাদমাধ্যম ওই এলাকা থেকে খানিকটা দূরে আরেকটা জায়গার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল যেখানে আরও বেশি সংখ্যক অচেনা মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে এবং স্থানীয় মানুষ ওই এলাকাটিকে 'ছোটো পাকিস্তান' বলে সম্বোধন করে।

লকডাউনের সময় দেখা গেছে পাহাড় জুড়ে অরুন্ধতী রায়ের মতো মিশনারি ঘরানার অতিবাম লেখক-লেখিকার বিভিন্ন বই নেপালিতে অনুবাদ করে পাহাড়ে ঘুরছে। গত ৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বিমল গুরুংয়ের সভাতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাপোসটোলিক প্যাস্টাল কংগ্রেস ইউনাইটেড কিংডমের এশিয়া অ্যান্ড মিডিল ইস্টের রিজিওনাল বিশপ ড. অনিল সাম জর্জ। তাঁর পরিচয়ে বলা হয়েছে ওই ব্যক্তি সমস্ত এশিয়া ও ইউনাইটেড কিংডম মিলে ৭৫০০০টি চার্চ পরিচালনা করেন। কানাঘুসো, ওই ব্যক্তিই নাকি ওই দিনের বিমলের সভার মোট ব্যয়ের একটি ভালো অংশ বহন করেছেন। সেই ব্যক্তি মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে নিজের পরিচয়ে নিজেকে সংখ্যালঘু প্রবক্তা হিসেবে উল্লেখ করে গোর্খাল্যান্ডের লড়াইয়ের জন্য সমস্ত সংখ্যালঘুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন —'এবার বিশ্ব জানতে পারবে গোর্খা কাদের বলে?' এই ব্যক্তির হুংকারে স্পষ্টতই জঙ্গি আন্দোলনের প্রস্তুতির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ওইদিন মঞ্চে উপস্থিত বক্তা এবং পাহাড়ের প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা ওই ব্যক্তিকে চেনেন না বললেই হয়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ওই ব্যক্তি কে? উনি এই সভার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ দিয়েছেন এমনটা শোনা যাচ্ছে কেন? তাহলে কি রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে পাহাড়ে চার্চ-জেহাদি- অতিবাম ককটেলের বিদেশি মদতপুষ্ট টুকরে টুকরে গ্যাঙের নতুন খেলা শুরু হতে যাচ্ছে? বিমল গুরুং কি মমতার পাশাপাশি এই গ্যাঙকেও খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে রাজনৈতিক ভাবে পুরুজ্জীবিত হতে চাইছেন? পাহাড় থেকে নেমে ডুয়ার্সে এলেও দেখা যাবে বনবাসীদের একাংশ আসন্ন জনগণনায় হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারনা উপাসনা পদ্ধতির জন্য পৃথক ধর্মীয় কোড চাইছে। এর জন্য পদযাত্রা হচ্ছে, রেল রোকো হচ্ছে। সমতলেও খ্রিস্টান মিশনারিদের সক্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজ রাজবংশীরা হিন্দু সংস্কৃতির অংশ নয় এমন তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, টুকরে টুকরে গ্যাঙের বর্তমান লক্ষ্য কি চিকেন নেকের ভৌগোলিক ঠিকানা উত্তরবঙ্গ? □

এখন থেকে 'প্রণব' পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যাবে—
www.bsspronabpub.com
প্রণব সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য
ব্যবহার করুন—
swamivedanandamaharaj@gmail.com
maharajswaminirmalananda@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-তৃণমূলের নৈরাজ্যের রাজনীতি

পুলকনারায়ণ ধর

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসেছিলেন ভারতীয় জনতাপার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা। ১০ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবারে একটি সভায় যাবার সময় পথে শিরাকোলে তাঁর কনভয়ের ওপর আক্রমণ হলো। তৃণমূলের পতাকা দেখিয়ে 'গো-ব্যাক' ধ্বনি উঠল। কিন্তু তা অহিংস রইল না। জে পি নাড্ডা-সহ রাজ্যের বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের ও মুকুল রায়ের গাড়ির ওপরও ইট-পাটকেল ছোঁড়া হলো। তাঁদের গাড়ির কাচ ভাঙা হলো। এই ধরনের আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী নেতাদের ওপর আকছার ঘটে চলেছে। কিন্তু অন্য কোনো রাজ্যে গিয়ে জে পি নাড্ডার মতো নেতার এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে শুনিনি। এ রাজ্যেই বিরোধীরা এই ভাবে আক্রান্ত হন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এটাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি। বিরোধীদের বাকরুদ্ধ করা। এই সংস্কৃতি গণতন্ত্রের সংস্কৃতি নয়, এটা অসহিষ্ণুতার রাজনীতি।

এই রাজনীতি আজ তৃণমূল দলের হলমার্ক হলেও তা তৃণমূলের অবিষ্কার নয়। এর একটা পরম্পরা আছে। এই রাজনীতির ধারা কিন্তু সৃষ্টি করেছে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা যারা প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট তৈরি করে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একদা স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রী। ১৯৬৭ সালকে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির সূচনা পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করলেও ভুলে গেলে চলবে না যে বামরাজনীতি তার জন্ম লগ্ন থেকেই (১৯২৫) ভেঙে দেওয়ার গুড়িয়ে দেওয়ার মন্ত্রই জপে চলেছে। যা ছিল দলগত তা ১৯৬৭ সালেই সরকারি সিলমোহর পেল। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেই ধারাই প্রবহমান। ১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় এসেই এক নতুন হিংস্রতার জন্ম দিল। তারা কংগ্রেসকর্মীদের হত্যালীলায় মেতে উঠল। ১৯৬৭ সালে সরকার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বেই ভেঙে গেল। রাজ্যকে হিংসাত্মক রাজনীতিতে সিপিএম ঠেলে দিল। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় আসে। এবং বিপ্লবকে তরান্বিত করার জন্য প্রশাসন ও পুলিশকে ব্যবহার করতে শুরু করে। কৃষিজমি দখল, জমির মালিকদের শত্রুজ্ঞানে নিধন এবং সাংবিধানিক অধিকার থেকে

ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি।

বিরোধীদের বঞ্চনা এসব দস্তুর হয়ে দাঁড়ল। সিপিএম নেতা ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ও নীতি ঘোষণা করে বলেন, 'We shall wreck constitution from within'। সিপিআই নেতা এসএ ডাঙ্গের সঙ্গে তত্ত্বের কচকচি আকচা-আকচি শুরু হলো। কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবের উত্তেজনা ছড়াল। সিপিএম জমি দখলের রাজনীতি করে যখন বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছিল সে সময় হঠাৎ করেই (১৯৬৯) আবার ক্ষমতায় আসীন হলো। ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে হিংসা, ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের উত্তেজনার আগুন জ্বালাতে জ্বালাতেই তারা সরকারের গদি দখল করেছিল। সুতরাং এই হিংস্র বাঘের পিঠের সওয়ার হয়েই সে বসে থাকতে বাধ্য হলো। প্রশাসনে এসে তারা এর গতিধারা একটু পরিবর্তনের চেষ্টা করে। কিন্তু ততদিনে বোতল থেকে 'জিন' বেরিয়ে পড়েছে। তারা বিপ্লবের গন্ধে উত্তেজিত। তারা নেতাদের কথায় কান দিল না। পরিণামে জন্ম নিল উগ্রপন্থী দল সিপিআই (এম-এল)। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে তারা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি হত্যা ও মনীষীদের মূর্তি ভাঙার রাজনীতি শুরু করে। অন্যদিকে সরকারের এক মন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জি কলকারখানায় 'ঘেরাও'-এর রাজনীতি করে পশ্চিমবঙ্গকে অরাজকতার গর্ভে নিক্ষেপ করেন। স্কুল-কলেজ আপিস সর্বত্র নৈরাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়কে তারই কর্মচারীরা (সিপিএম ইউনিয়ন কো-অরডিনেশন) রাইটার্সের অলিন্দে কাপড়ের কাছা ধরে টান দিয়ে হেনস্থা করে। নিজের সরকারের অরাজকতার বিরুদ্ধে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী কার্জন পার্কে বসে অনশন প্রতিবাদ শুরু করেন। সে এক অভাবনীয় নৈরাজ্যের অবস্থা। সিপিআই নেতা রাজেশ্বর রাও সিপিএমের নিন্দা করে বলেন 'dictatorial attitude'। আবার শরিকি দ্বন্দ্বে ফ্রন্টের পতন ঘটল। ১৬ মার্চ ১৯৭০ সালে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। সিপিআই-কে সিপিএম 'bastard child of congress communism' বলে অভিহিত করল। এদিকে ১ মে ১৯৬৯ সালে নকশাল নেতা কানু সান্যাল ঘোষণা করেন যে, লেনিনের জন্ম তারিখে ২২ এপ্রিল সিপিআই (এম-এল) দল গঠিত হয়েছে। এরপর চারিদিকে আগুনের রাজনীতির প্রবাহ চলল। রাস্তায় রাস্তায় নিরস্ত্র ট্র্যাফিক পুলিশ খতম, গুপ্তচর সন্দেহে যাকে-তাকে দিন-দুপুরে হত্যা এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়ে পরস্পর কমরেড নিধন হলো বিপ্লবের সমার্থক। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পুলিশও পাইকারি হারে 'নকশাল'দের হত্যা করতে থাকে। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন সমাপ্ত হয়ে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। পরীক্ষায় প্রকাশ্যে নকল করা ও নকশাল দমন একই সঙ্গে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। জন্ম হলো এক গুচ্ছ গুন্ডা ও সমাজ বিরোধীর। সমাজ বিরোধী বা অ্যান্টি সোশ্যাল কথাটি সেই সময়ই রাজনীতিতে বেশি প্রচলিত হলো। এদের ওপর ভরসা করেই সব দলের নেতারা নির্বাচনে লড়াই করতে শুরু করে। এই 'সামাজ বিরোধীরা' সুবিধাভোগী ও বেতনভুক্ত (তোলাবাজ) সদস্য হিসেবে সুবিধা মতো দল বদল করে। এদের একটা বড়ো অংশ ধুতি-পাঞ্জাবি বা চোগাচাপকান পরিধান করে নেতা হয়ে উঠতে লাগল। সে প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধানের প্রদত্ত সমস্ত অধিকার খর্ব করেন। বিরোধী নেতারা ও সাংবাদিকরাও জেলবন্দি হলেন। তাঁর একদলীয় আধিপত্যবাদের সমাপ্তি ঘটল

১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে তাঁর গো-হারান পরাজয়ে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের নেতৃত্বে জ্যোতি বসু বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। কিন্তু মানুষ স্বৈরাচার থেকে মুক্তি পেল না। সিপিএম কিন্তু বিপ্লবী বুলি আউড়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত করতেই সর্বশক্তি নিয়োগ করল। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের অরাজকতার চিহ্ন নির্মূল হলো না। কিন্তু এবার তা চলল নতুন পদ্ধতিতে প্রশাসন ও পুলিশকে ব্যবহার করে। সূক্ষ্মভাবে। ১৯৬৭/১৯৬৯ এবং ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল এই ৩৫-৩৬ বছরে সিপিএম এক ভণ্ডামির ও মারদাঙ্গার রাজনৈতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। ২০১১ সালে তার শাসনের সমাপ্তি ঘটল এবং তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের জোট সরকার গঠিত হলো। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা কিন্তু এই সরকারও পূর্ণ করতে পারল না। বলা যেতে পারে চাইল না। প্রথম দু-এক বছরের মধ্যেই জোট সরকার থেকে তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসকে হটিয়ে দিলেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন সরকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে কোনো সদিচ্ছা নেই তা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। সিপিএমের মতোই অধিকারতন্ত্র বা দখলতান্ত্রিকতা এই দলকেও গ্রাস করে। সব কিছুই সে দখল করতে চায় বাহুবলে। প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বত্রই দলীয় অযোগ্য ব্যক্তিদের বসানো হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের ভৃত্য বানাবার চেষ্টা হলো। ভৃত্যবৃত্তি যারা পালন করতে সামান্যও আপত্তি জানিয়েছেন সমস্ত নীতি ও নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাঁদের অপসারণ করাই সে সমীচীন মনে করেছে। প্রয়োজনবোধে স্বদলীয় ছাত্রদেরও তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যের আমদানি হলো তার কোনো তুলনা নেই। এই অবস্থা সিপিএমের পালকিবাহক বুদ্ধিজীবী ও কবি সাহিত্যিকের দল তৃণমূলের তল্পিবাহক হতে হাত-জোড় করে দাঁড়ালেন। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরানো কৃতদাস প্রথা বজায় রইল। এঁরা নতুন দল ও সরকারের জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার এবং কলম বেঁকিয়ে রচনাবলী নির্মাণ করেন। নানা 'শ্রী'তে ভূষিত হলেন। এইসব গুন্ডা ও পণ্ডিতদের সহায়তায় ২০১৬ সালের নির্বাচনে আবার ফিরে এল 'রিগিং' নামক কালাপাহাড়। পঞ্চায়েতের মতো নির্বাচনেই প্রায় ১০০ জন ব্যক্তির মৃত্যু হলো। শতকরা ৩৭ ভাগ আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হলো না শাসকদলের রক্তচক্ষুর শাসনে। গণতন্ত্রের খোলসে সর্বত্র নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার রাজনীতির প্রেতনৃত্য চলছে। এই 'রিগিং' নৃত্যকলা তৃণমূল সিপিএমের ঘরানা থেকেই লাভ করেছে। যেখানে যেখানে তার শক্তি বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে সেখানে তার ডাকাত বাহিনীও ভোট ডাকাতি করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির সঙ্গে ভোটের অঙ্কে আরও এক নতুন হিসেব যুক্ত হয়েছে যা খুবই বিপজ্জনক এক ধারা। এই ধারা হচ্ছে মুসলমান সাম্প্রাদায়িকতা। সিপিএম আমলে জনবিন্যাসকে দুমড়ে মুচড়ে ভোটের পক্ষে আনবার চেষ্টা সিপিএম করে চলেছিল সূক্ষ্ম ভাবে। কিন্তু বর্তমান সরকার বা দল কোনো পর্দা ঢাকা না দিয়েই একেবারে খোলাখুলি শুরু করেছে। কারণ তার নীতি 'যে গোরু দুধ দেয় তার চাট খেতেই হবে।' এই গোরুকে পুষ্ট করতে চলছে 'অনুপ্রবেশ'। পশ্চিমবঙ্গে তাই এখন চলছে ১৯৪০-এর সময়ের মুসলিম লিগ তথা সোহরাবর্দির হিন্দু বিরোধী রাজনীতি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পশ্চাৎপট পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনীতির চরিত্র। জেহাদি মুসলমানরা আজ বুঝিয়ে দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাদের অস্তিত্বই মূল বিবেচ্য বস্তু। রাজাবাজারে ২৬টি ট্রামে অগ্নিসংযোগ, মালদার কালিয়াচক পুলিশ থানায় অগ্নিসংযোগ, দেগঙ্গা, তেহট্ট হাওড়া, ধুলাগড়, হলদিয়া এবং খোদ কলকাতায় এসপ্ল্যানেডের জমায়েত পুলিশের ওপর আক্রমণ, আলিপুরে টেবিলের নীচে পুলিশের লুকিয়ে থাকা, মুর্শিদাবাদে বেআইনি কাজের রমরমা, খাগড়াগড়ে সন্ত্রাসবাদের আখড়া স্থাপন প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত বর্তমান তৃণমূল শাসকের প্রকাশ্য মদতেই চলছে। রাজনীতিতে যারা পাক ঘেঁটে ভোট সংগ্রহ করতে পারবে সেইসব ভৈরব বাহিনী দিয়ে গণতন্ত্র চালাতে হবে জেনেই এদের পোষ্যপুত্র রেখেছে তৃণমূল দল। এরাই আপন মহিমা প্রচারে বিরোধীদের কোনো মিটিং মিছিল করতে দেয় না। এরাই বিরোধী নেতাদের গাড়ি ভাঙচুর করে। সাধারণের মনে সন্ত্রাস উৎপাদন করার জন্য বিপক্ষ দলের কর্মীদের হত্যা করে মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ভয়ংকর রাজনীতির স্রোতকে প্রতিহত করাই আজ আশু কর্তব্য। আজ এক ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গেলেও মানুষ আলোর সন্ধান পাচ্ছে। তাই আমরা বলতে পারি 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো/সেই তো তোমার আলো'। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব

কালচার

যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

দশ বছরেই নাভিশ্বাস

দ্রুত বদলে যাচ্ছে তৃণমূলি পশ্চিমবঙ্গ

সুজিত রায়

১৯৭০ সালে বর্ধমান জেলার সিপিআই (এম) নেতৃত্ব যেদিন সাঁই পরিবারের ভাইদের মুণ্ডু কেটে নিয়ে তাদেরই রক্তে মাখা ভাত তুলে দিয়েছিলেন তাদের গর্ভধারিণীর মুখে, সেদিনই এরাজ্যে রাজনীতির ভবিষ্যৎ ঠিক কোন খাতে গড়াবে তা স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল।

তার আগে যখন এরাজ্যে নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত হলো, তখনও ধারাবাহিক রাজনৈতিক খুনের একটা ইতিহাস সংযোজিত হয়েছিল রাজ্যের অপরাধ-তালিকার পৃষ্ঠা জুড়ে। কিন্তু সেই অপরাধ তালিকার পিছনে ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যের একটি যৌথ প্রশাসনিক উদ্যোগ— একটা নয়া মেজাজের 'তীব্র ধ্বংসাত্মক ও আত্মঘাতী নবীন প্রজন্মের আন্দোলন'কে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া। কারণ নকশাল আন্দোলন কোনও জনজাগরণের আন্দোলন না হলেও, চারিত্রিক ভাবে রাজনৈতিক আদর্শগত ফারাকের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই অতি বাম আন্দোলন গড়াচ্ছিল 'ছাঁচ ভেঙে ফেল' আন্দোলনের দিকে। সেই আন্দোলনকে ভেঙে ফেলতে সে যুগের সিদ্ধার্থ-জমানা এতটুকুও রিস্ক নেয়নি সময় নষ্ট করার। পুলিশ, গুন্ডা, সমাজ বিরোধীদের সর্বস্তরে নিয়োগ করে ওই আন্দোলনকে গলা টিপে মেরেছিলেন মাত্র কয়েকটা বছরেই।

কিন্তু ১৯৭৭-এর পর থেকে টানা ৩৪ বছর ধরে সিপিআই(এম)- এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে যে খুনের রাজনীতি (Murder for Political Gain) প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল, তা ছিল তুলনাহীন। মেইনস্ট্রিম উইকলির ২০১০ সালের ২২ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'Consus of Political Murders in West Bengal during CPI (M) Rule 1977-2009'-এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক খুনের সংখ্যা ছিল ২৮০০০। হিসেবমতো প্রতিমাসে ১২৫ থেকে ১২৬ জন। দিনে গড়ে ৪ জন।

রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যাটা পরবর্তী পর্যায়ে কমেনি। বরং বাড়তেই থেকেছে। কারণ রাজ্যের শাসক বামফ্রন্ট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ক্রমশ তার মুঠির জোর হারাচ্ছিল। তখন বামফ্রন্টের একমাত্র বল গায়ের জোর। ২০১১ সালের ১৬ জুলাই দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় হিসেব দেওয়া হয়েছিল— শুধুমাত্র ২০০৯ সালেই খুন হয়েছিল ২২৮৪টি। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ২৫১৬টি। শ্লীলতাহানি হয়েছিল ৩০১৩ জন মহিলার। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল ১৭৫৭১টি। মাওবাদী কর্মী খুন হয়েছিলেন ১৩৪ জন।

১৯৭৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১৭৮৭ জন খুন হয়েছেন। মোট মৃত্যুর সংখ্যা সরকারিভাবে ৫৫৪০৮। বেসরকারি মতে সাড়ে ৫৫ হাজার। মামলা দায়ের হয়েছে ৩০ থেকে ৪০ হাজার। শাস্তি পেয়েছেন ক'জন? ন্যূনতম।

বামফ্রন্ট প্রশাসনের শেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক হানাহানির এত রমরমার কারণ ছিল :

১। মাওবাদীদের উত্থান।

২। প্রশাসনিক জোর কমে যাওয়া।

৩। সিপিআই (এম)-এর আকাশ ছোঁওয়া দুর্নীতি ।

৪। এই সমস্ত দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাতে তৃণমূল কংগ্রেসের আচমকাই উত্থান, যে উত্থানে সঙ্গী হয়েছিলেন রাজ্যের ও দেশের স্বার্থপরায়ণ নির্লজ্জ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এবং সমাজসেবী সংগঠনের ছত্রছায়ায় বেশ কিছু বিদেশি শক্তি যারা বহুদিন আগে থেকেই বামপন্থী প্রশাসনের মৃত্যু দেখতে তৎপর ছিল।

ফলত 'পরিবর্তন'-এর হাওয়া তুলে, আপাতত সততার একটা মুখোশ পরে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সার্কাস পার্টি ২০১১-য় হাসতে হাসতে ক্ষমতায় বসে গেল। এবং যা হবার ছিল, তাই হলো। সিপিআই (এম)-এর চটি পায়ে গলিয়ে শুধু রাজনৈতিক খুন নয়, খুনের রাজনীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক অসভ্যতা, বিশৃঙ্খলা। দলীয় দুর্নীতি, প্রশাসনিক অভদ্রতা এবং মাও রাজনীতিকে মাথায় তুলে নিয়ে একটা হযবরল প্রশাসন কায়েম করলেন যার সবরকম বিশ্লেষণের শেষেও হাতে পেনসিল ছাড়া আর কিছুই থাকে না। মা মাটি মানুষের মতো যাত্রাপালাধর্মী স্লোগান তুলেও এ সরকার বঙ্গসংস্কৃতিকে লাটে তুলে দিয়েছে। মাওবাদীদের সাহায্যে মেদিনীপুরের সবং, পিংলা, শালবনী, কেশপুর, ঝাড়গ্রাম, কোতলপুর-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অরাজক প্রশাসন কায়েম করে শেষ পর্যন্ত তাদেরই নিকেশ করে অথবা ঘরবন্দি করে নিজের চেয়ারকে সুরক্ষিত করে নিয়েছে। মাওবাদী নেতাদের যারা ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেন, তাদের মন্ত্রী-সান্ত্রী বানিয়ে নিজের চারপাশে একটা সুরক্ষা বলয় গড়ে নিয়ে যে পাঁচমিশালি এবং বদখত এক এ যাবৎ অপরিলক্ষিত রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন বিষকন্যা মমতা, তার ফলে গোটা রাজ্যটাই এখন বিষিয়ে গেছে বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণিপাকে। সেই বিশৃঙ্খলার শরিক যেমন পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, ঘরে ঘরে জন্ম দিয়েছে দিদির ভাই-ভাইপোদের, তেমনি অশিক্ষিত, অবুঝ গোঁয়ার মুসলমান সম্প্রদায়কেও কাজে লাগিয়ে রাজ্যের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মেরে পাট করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে এক জঙ্গলরাজের, যেখানে দিনে-রাতে অস্ত্র ও মুদ্রার ঝনঝনানি ছড়িয়ে হুংকার তোলে মানুষ-মুখোশধারী নেকড়ে ও হায়নারা। যেখানে মাত্র দশ বছরেই শিক্ষার সংজ্ঞাটি বদলে দেওয়া হয়। সংস্কৃতির সংজ্ঞা মানে দাঁড়ায় ট্রাফিক সিগনালে রবীন্দ্রসংগীত বাজানো, যেখানে নারী প্রগতির সংজ্ঞা হলো কন্যাশ্রী আর রূপশ্রী প্রকল্পের ছদ্মনামে ঘুষ দিয়ে ভোট কেনা, যেখানে যুবশক্তির প্রগতি

বাম জমানার কয়েকটি বিশেষ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ।

১৯৭৯: ক্যাডার ও পুলিশ দিয়ে মরিচঝাঁপি দ্বীপে শরণার্থীদের উপর হামলা। হতাহত বহু। উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন দণ্ডকারণ্য থেকে

১৯৮২: ক্যাডারেরা কলকাতার বুকে ১৭ জন আনন্দমার্গীকে পুড়িয়ে মারে। অভিযোগ ছিল, তারা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে

২০০০: বীরভূম, কেশপুর ও গড়বেতায় এলাকা দখলের লড়াইয়ে অনেকে নিহত হন। হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি

২০০১: ছোট আঙারিয়া গ্রামে মানুষকে পুড়িয়ে মারার জন্য সিপিএমের গুন্ডারা একটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। হতাহতের সংখ্যা অজ্ঞাত

২০০৭: জমি নিয়ে ১১ মাস ধরে নন্দীগ্রামে সংঘর্ষ চলে। গুন্ডা দিয়ে এলাকা দখল করে সিপিএম। কতজন মারা গিয়েছেন এখনও জানা যায়নি

মানে ক্লাবে ক্লাবে কোটি কোটি টাকা ছড়িয়ে রিগিং মাস্টার তৈরি করা, যেখানে সামাজিক প্রকল্প মানে কাটমানির জামদানি ঝিল্লি গড়ে তোলা, যেখানে রাজনীতি মানে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদের পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়ে ভাইপো ও ভাইদের সামনের সারিতে বসিয়ে দেওয়া, যেখানে চাকরির সংজ্ঞা হলো পার্টটাইমার, যেখানে আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএসদের চাকর বানিয়ে রাখাটাই হলো প্রশাসনিক ধর্ম, যেখানে সরকারি অর্থ মানে হলো মুখ্যমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল— যেন সরকারি অর্থ মানে মুখ্যমন্ত্রীর জায়গির। ফলত, বামফ্রন্টের রেখে যাওয়া ১ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকার ঋণ গত দশ বছরে পৌঁছেছে প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকায়। অর্থাৎ আজ যে শিশু জন্মাচ্ছে তার মাথায় দেনার বোঝা থাকছে ৫০ হাজার টাকা।

এই সমস্ত কারণগুলিই আজ গোটা রাজ্যের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দল এবং ওই দল পরিচালিত প্রশাসনের প্রতি বিতৃষ্ণায় ঘৃণার থুতু ছেটাচ্ছে মানুষ এবং সমস্ত বিপক্ষ দল। এবং যা হয়ে থাকে, সেটাই হচ্ছে এ রাজ্যেও, পায়ের তলায় মাটি যত সরছে ততই হিংস্র হয়ে উঠছে সরকার। অশান্তির দাবানলে পুড়ছে গোটা রাজ্য।

এই মুহূর্তে এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখোমুখি যুযুধান ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি, যে দল ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছে প্রায় গোটা ভারতবর্ষই। বাকি রাজনৈতিক শক্তিগুলিই অন্য রাজ্যের মতো ক্ষয়িষ্ণু, অপস্রিয়মাণ।

অতএব সরকার ও শাসক দলের এখন যৌথ প্রয়াস হলো— বিজেপির ফণা কেটে নাও। থেঁতলে শেষ করে দাও তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে। ফলত গত বছর তিনেকের মধ্যেই অতীতের 'বামপন্থী মারো'-র নীতি অনুসরণ করেই তৃণমূল কংগ্রেস নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ১৩৪ জন বিজেপি কর্মী ও নেতাকে। সর্বত্র প্রকাশ্যে নয়। রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে গাছের ডালে পুরুলিয়ার ত্রিলোচন মাহাত্যের মতো বহু বিজেপি কর্মীকেই। আর সরকারিভাবে বলা হয়— ওটা খুন নয়, আত্মহত্যা। নৃশংসভাবে খুন করার পর মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হয় ঝোপে জঙ্গলে। সরকারিভাবে বলা হয় মৃত্যু হয়েছে পারিবারিক বিবাদের জেরে। পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রশাসনিক প্রধানের নেতৃত্বে কোনো বিরোধী দল মিছিল করতে পারবে না। মিটিং করতে পারবে না। স্লোগান দিতে পারবে না। হোর্ডিং, ব্যানার, পতাকা টাঙাতে পারবে না। কারণ তাতে সরকারের মুখোশ খুলে পড়বে। ভাই-ভাইপো-ভাইপো বউয়ের বালিচুরি, কয়লা চুরি, সোনাপাচার, গোরুপাচারের কীর্তিকাহিনি প্রকাশ্যে এসে যাবে। অতএব চালাও ছররা (গুলি নয়), মেরে ফেলো বিজেপি কর্মীদের মুখ উলেন রায়কে। আর বলে দাও, ছররা এসেছে নাকি মিছিল থেকেই। অতএব চালাও জলকামান। জলে মিশিয়ে দাও রাসায়নিক। যাতে শরীরের চামড়া জ্বলতে থাকে মিছিলকারীদের। অতএবং কোনো মৃতদেহের পোস্টমর্টেম হবে না। দেওয়া হবে সাজানো রিপোর্ট। পরীক্ষা হবে না। পাশ করিয়ে দাও যথেচ্ছ নম্বর দিয়ে। ভোট বাড়বে। স্কলারশিপ বেশি করে দাও মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের, ভাতা দাও ইমামদের। যাতে মিম কিংবা ফুরফুরা শরিফ তৃণমূলের মুসলমান ভোটে ভাগ বসাতে না পারে। কাঁদুক বীরভূমের লাল্টু দাসের মা। লাল্টু তো এনকাউন্টারে মরেনি। গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে। কাঁদুক বাঁকুড়ার অজিত দাসের মা। অজিত দাস তো মরেছে পথ দুর্ঘটনায়। বুক চাপড়াক বসিরহাটের মানিক ঘোষ, উত্তর দিনাজপুরের টোটন দাসের পরিবার যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হয়েছিল মুসলমান তৃণমূল কর্মীদের হাতে। পুরুলিয়ার শিশুপাল সহিস, জগন্নাথ টুডু, ঝাড়গ্রামের মাতাল দিগর, নদীয়ার বিপ্লব শিকদার, পশ্চিম মেদিনীপুরের শতদল মাইতিরা বিজেপির ঝান্ডা কাঁধে নেওয়ার অপরাধে এইভাবে প্রতিদিন খুন হয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের ভৈরববাহিনীর হাতে। রেহাই পাচ্ছেন না টিটাগড়ের কাউন্সিলার মনীশ শুক্লারাও। শ'য়ে শ'য়ে পরিবার পুরুষ সদস্য হারিয়ে পরিণত হচ্ছে পথের ভিখারিতে। আর মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার সম্পত্তি গড়ছে ব্যাংককে, সিঙ্গাপুরে, আমেরিকায় বেনামে, বেজন্মার নামে।

অতএব, গোটা দেশের বিশৃঙ্খল রাজ্যের শীর্ষ তালিকায় ব্ল্যাক জাপানি কালিতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গের নাম। রাজ্য জ্বলছে। দশ বছরেই পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের অর্ধদগ্ধ পশ্চিমবঙ্গ। গুলি, বোমা, বারুদে গোটা রাজ্যকে নরকে পরিণত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা যিনি প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন বিজেপিকে লক্ষ্য করে— 'আমায় আঘাত করলে এমন প্রত্যাঘাত করব যে জীবনেও ভুলতে পারবেন না'। কারণ উনি গুন্ডা পোষেন। ছত্রধর মাহাতোর মতো, পূর্ণেন্দু বসুর মতো, দোলা সেনের মতো, পাঁচু রায়ের মতো মাওবাদীদেরও পোষেণ।

কিন্তু রাজ্যের পালে এখন গেরুয়া রঙের ফাগুয়ার মেলা হাওয়া বদলাচ্ছে দ্রুত। অত্যাচারের ফল তো এটাই যে হিটলারকেও মরতে হয়েছিল সস্ত্রীক মাটির গহ্বরে বিষ খেয়ে। তৃণমূল এখন হালভাঙা নৌকো। তার পাল ছেঁড়া। দল থেকে নেতারা, কর্মীরা, সমর্থকরা, সমব্যথীরা খসে পড়ছেন রাতের খসে পড়া তারার মতো। যতদিন যাবে, যতদিন উনি 'অঙ্কা বঙ্কা শঙ্কা' কিংবা 'হাড্ডা, চাড্ডা, নাড্ডা' কিংবা ধুপুস ধাপুস ধপাস করে মঞ্চে মঞ্চে উচ্চিংড়ের মতো লাফাবেন, ততই খসবে পলকা দেওয়াল। বুঝবেন, কংগ্রেসকে ধ্বংস করে যে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম উনি দিয়েছিলেন, সেটা আসলে ছিল সাজানো গোছানো তাসের ঘর। সাইক্লোনের ধাক্কা কখনও খায়নি সেই পলকা দেওয়াল। তাই দশ বছর ধরে কামিয়েছেন নিশ্চিন্তে।

এবার পালে বাঘ পড়েছে। বালি খাদান, কয়লা খাদান সব মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রীকে গিলে খাবে বলে। থরে থরে সাজানো স্বর্ণালংকার, সোনার বাট আর নোটের তাড়াগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ার অপেক্ষায়।

দিন এসে গেছে। কালীঘাটের খালপাড়ে এবার আগুন জ্বলবে। পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ব্যানার্জি পরিবারের যত সুখ যত সমৃদ্ধি। শ্মশানের শান্তি কাকে বলে বুঝবেন উনি। □

খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মদত দিচ্ছেন সন্ত্রাসে

বিশ্বপ্রিয় দাস

১৫ ডিসেম্বর জলপাইগুলির প্রকাশ্য জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো হুংকার ছেড়ে বললেন, 'যদি বিজেপি আঘাত করে, তাহলে তিনি ও তাঁর দল চরম প্রত্যাঘাত করবে।' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মদত এর থেকে আর কী বেশি হতে পারে। ঠিক তাঁর আগেরদিন ঘোলায় দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের মারধোর করে রাজ্যের শাসক দল। এতো গেল মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। এরকম বহু উদাহরণ গত এক বছরের মধ্যে সংবাদপত্রের পাতায় শিরোনাম হয়ে উঠে এসেছে।

তবে সবচেয়ে বড়ো শিরোরাম অবশ্যই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা। যেটা কিনা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। এমনকী স্থানীয় সূত্র জানিয়েও ছিল সে কথা। শিরাকোলের আগে যে রাজ্যের শাসকদল এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করবে, সেটাও আগাম খবর ছিল প্রশাসনের কাছে, সেরকটাই জানিয়েছে স্থানীয় মানুষজন। তারা জানিয়েছেন, আগেরদিন রাত থেকেই মানুষজন আসতে শুরু করে দিয়েছিল, কেননা জমায়েতে প্রচুর মানুষ দরকার, এরকমটাই দলের তরফে নির্দেশ ছিল বলে ওই সূত্রটি জানায়। তারপরের ঘটনাটি কারোর কাছেই আজকের দিনে অজানা নয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের আমদানি শুরু হয় সেই ষাটের দশকের শেষভাগ থেকেই। এরপর সত্তরের দশকে সেই সন্ত্রাসবাদ বা রক্ত ঝরানোর রাজনীতি সত্তরের দশককে কালিমালিপ্ত করেছে। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ঢুকে পড়ে বাহুবল। যার বাহুবল বেশি, সেই ক্ষমতাধর হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করে। এরই হাত ধরেই রাজনীতিতে চলে আসে গুন্ডারাজ ও এলাকা দখলের লড়াই। সেই সময়ের ডানপন্থী রাজনীতির মানুষদের ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়ার একটা ভয়ানক চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। বামেদের মতবাদের মধ্যে দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে আসে নকশালরা। শুরুতে একটা আদর্শের রাজনীতি থাকলেও পরবর্তীতে হিংসার রাজনীতিতে রক্তাক্ত করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অঙ্গনকে। আশির দশকের বামেদের দমন ও পীড়ন সহযোগে ক্ষমতাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা জন্ম দেয় আরেক সন্ত্রাসের রাজনীতি। চালু হয় একটি শব্দ, হার্মাদ। নব্বইয়ের দশকের একেবারে মাঝামাঝি থেকে একট চোরা উলটো স্রোত বইতে থাকে। জঙ্গলমহলে জন্ম নেয় একটি অন্য চিন্তাধারা। পাহাড়ে জন্ম নেয় অন্য আরেকটি চিন্তাধারা, উত্তরবঙ্গে জন্ম নেয় প্রাদেশিক একটি ভাবনা। এই সব কিছুর সঙ্গেই মিশে যায় রাজনীতি ও সন্ত্রাসের মিলিত ধারা।

২০১১ সালে বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় আসে সেই বাহুবলেই। পরবর্তীতে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়, সেই সময় মানুষ দেখেছে রাজনীতির মদতে কেন্দ্রীভূত একটি সন্ত্রাসের ধারা। যেটি সরকারি মদতপুষ্ট। গত পাঁচ বছরের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গে জায়গায় জায়গায় বোমার কারখানা, অস্ত্র তৈরির কারখানা, সিন্ডিকেটরাজের এলাকা দখলের লড়াই, বিপক্ষ দলের অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টা। এই সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ধারা। বর্তমান শাসকদল সরকারের বিরোধিতা একেবারেই পছন্দ করে না। তাই মানুষ যখন তাদের বিরোধিতা করছে, তখন তাদের কণ্ঠকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিচ্ছে। এখন রাজ্যে প্রধান বিপক্ষ শক্তি হলো বিজেপি। শাসকদলের গুন্ডার আক্রমণে ইতিমধ্যে তাঁদের ১৫০-র কাছাকাছি কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই হিসেব গত এক বছরের। তাঁর আগের একটি হিসেব পাওয়া গেছে, ২০১৮ সালে বিজেপির যখন উত্থান ঘটছে, তখন প্রতিমাসে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের হাতে ২ জন করে মারা গেছেন। কয়েকদিন আগে মনীশ শুক্লা বা সৈকত ভাওয়ালের মৃত্যু সেই দিককেই নির্দেশ করেছে।

রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমো আবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি নিজেই প্রত্যাঘাতের নামে রাজ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে উজ্জীবিত করছেন। আর তাঁর ভাইয়েরা উল্লাসে বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর রক্তে হোলি খেলছে। এটা নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না।

শাসকদলের প্রচ্ছন্ন মদতে পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলেছে এই গত দশ বছরের মধ্যেই। সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড়ঘর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে এই রাজ্য। এই রাজ্য থেকে একেবারে হার্ডকোর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সদস্যদের হদিশ মিলেছে । ফলে সন্ত্রাসের একেবারে আঁতুড়ঘর হিসেবে একেবারে একশো ধাপ এগিয়ে রয়েছে এই রাজ্য। এই সন্ত্রাস চায় না আপামর রাজ্যবাসী। মননে ও চিন্তনে তারা চায় অন্য পশ্চিমবঙ্গকে। যে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিশারি হয়ে পথ দেখাবে সারা ভারতবর্ষকে, যেমনটি দেখিয়েছে ভারতের নবজাগরণের সময়ে।

বহিরাগত-তত্ত্ব ও জাতীয়-সংগীত বিতর্ক

বিশ্বামিত্র

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলবদল ছাড়া যে দুটি বিষয় নিয়ে বলা যায় একপ্রকার তোলপাড় চলছে, আপাত-সম্বন্ধহীন হলেও দুটি যে একসূত্রেই গাঁথা, তা-ই আমরা আলোচনা করবো। প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রী এক জনসভায় বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে 'বহিরাগত' আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের এই আচরণ অবশ্য নতুন কিছু নয়। বাম জমানায় জ্যোতি বসুর আমলের একেবারে শেষদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শনজীর কলকাতা-সফরের প্রসঙ্গে জ্যোতি বসু তাঁকে 'পশ্চিমবঙ্গের অবাঞ্ছিত অতিথি' বলে সম্বোধন করেছিলেন। একটু উত্তেজিত না হয়ে সুদর্শনজী বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গটা তো আর সিপিএমের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, তিনি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক, দেশের যে কোনও প্রান্তে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। প্রায় কুড়ি বছর আগে বলা কথাগুলো এখনও কত প্রাসঙ্গিক হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। আসলে যখন নিজেদের আয়ত্তের বাইরে সব কিছু চলে যায়, নিজেদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হয়, তখন শেষ ভরসা হিসেবে মানুষের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা হয়। বাম আমলের শেষেও এই ঘটনা দেখা গেছে, হাল আমলও তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

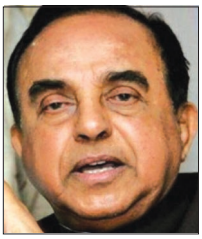

জাতীয় সংগীতের গানের লাইন প্রয়োজনে বদল করা যেতে পারে।

বিজেপি-বিরোধীরা ভোটে হারার জ্বালা মেটায় গণতান্ত্রিক পরিবেশকে অসুস্থ করে। সুতরাং এখন এদেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণ করা সম্ভব নয় কোনোমতেই, বিরোধীদের জন্যই। ফলে সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে রবীন্দ্র-বিদ্বেষী সাজানোর নাটক চলবে, এমনটা সাম্প্রতিক অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হয়তো হবে।

সে সবই ঠিক আছে। কিন্তু এই আবেগে কেউ সওয়ার হলে আমাদের বাড়তি উদ্বেগের কারণ আছে বই কী! বহিরাগত তত্ত্বটা নতুন মোড়কে পরিবেশিত হলেও এটা যে অবাঙ্গালি-বিদ্বেষের নামান্তর মাত্র তা বুঝতে কারুর বাকি নেই। অর্থাৎ 'পক্ষ' নামধারী রাজ্যের শাসকদলের তল্পিবাহক জাতিদাঙ্গাকারী গোষ্ঠী অবাঙ্গালি দেখলেই যেমন 'গুটখাখোর', 'ধোকলাখেকো' ইত্যাদি নামে দাগিয়ে দিত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তাদেরই দিকে, তিনি ভাষাটিকে একটু পরিশীলিত করেছেন মাত্র। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, 'পক্ষে'র ভোটের রাজনীতির বালাই নেই। তারা যা ইচ্ছে করলে কেউ বাধা দেবে না, যখন শাসক-গোষ্ঠী তাদের পক্ষেই রয়েছে। কিন্তু তৃণমূলের পক্ষে 'বহিরাগত' বলার বিপদ কী, সেটা দেখা যাচ্ছে দলের অন্দরেই বৈশালি ডালমিয়ার মতো বিধায়করা এ নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ ব্যক্ত করায়। এরপরে দলের পক্ষ থেকে 'বহিরাগত' নিয়ে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, এটা যে প্রকারান্তরে অবাঙ্গালি-বিদ্বেষ ছড়িয়ে ভোটের ফয়দা তোলার পক্ষে, তা সবাই বুঝে গেছে। এবং বিজেপিকে বাঙ্গালি-বিরোধী দল হিসেবে দাগিয়ে দিতে পারলে লাভটা যে কাদের সেটা সবাই বোঝে। 'স্বস্তিকা'র পাতায় এই কলমে ও অন্যত্র এ প্রসঙ্গে বহু আলোচিত, এখানে সেটা আলোচনার বিষয়ও নয়। শুধু একটাই কথা বলার, ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় সোহরাওয়ার্দি, মুজিবুর রহমানরা যে অখণ্ড বাঙ্গলা গড়ে হিন্দু-নিধন যজ্ঞের ছক কষেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একক কৃতিত্বে তাকে বানচাল করে দেওয়ার পর এখন সোহরাওয়ার্দিদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারীরা মুজিবুরের শতবর্ষকে সামনে রেখে পথে নেমেছে যদি তাদের মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে অখণ্ড বাংলা, 'বাংলাস্তান' গঠনের মাধ্যমে কোনোভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়।

এবার দ্বিতীয় বিষয়ে বলি। বিজেপিকে বঙ্গ-বিদ্বেষী বলার পরের পদক্ষেপও সকলের জানা। রবীন্দ্র-বিদ্বেষী বলে গোয়েবলসীয় প্রচার চালানো, এমসিআরটিই-র তথাকথিত সিলেবাস বদল থেকে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে বিভিন্ন ছুতোনাতায় হেনস্থা এসব লেগেই ছিল। সাম্প্রতিকতম নমুনাটি হলো, সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর বক্তব্য জাতীয় সংগীতের গানের লাইন প্রয়োজনে বদল করা যেতে পারে, ঘিরে উদ্ভূত বিতর্ক। স্বামীর বক্তব্য যদিও সাংবিধানিক আওতায় থেকে, অবশ্য এতে বাঙ্গালির ভাবাবেগ কতটা আহত হবে, এনিয়ে সুস্থ গণতান্ত্রিক বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু বিজেপি-বিরোধীরা ভোটে হারার জ্বালা মেটায় গণতান্ত্রিক পরিবেশকে অসুস্থ করে। সুতরাং এখন এদেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণ করা সম্ভব নয় কোনোমতেই, বিরোধীদের জন্যই। ফলে সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে রবীন্দ্র-বিদ্বেষী সাজানোর নাটক চলবে, এমনটা সাম্প্রতিক অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হয়তো হবে।

কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে বাংলাস্তান নামক ইসলামি রাষ্ট্রের গঠনের ও সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার সমর্থকদের আসল উদ্বেগটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাদের মুখপত্র-স্বরূপ একটি দৈনিক পত্রের, যার সম্পাদকীয় দপ্তর পুরোপুরি নকশাল পরিবেষ্টিত এবং এক বামপন্থী কবির কন্যা যিনি সম্পাদকীয়টি লিখেছেন বলে সূত্রের খবর, তাতে রীতিমতো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলা হয়েছে সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর বক্তব্যটার সঠিক বিশ্লেষণ করে দেখতে। মূল আপত্তি সিন্ধু শব্দটা নিয়ে, যেটি একদা অখণ্ড ভারতে থাকলেও দেশভাগের কারণে আপাতত ভারতে নেই। কবি-কন্যার আশঙ্কা, স্বামীর বক্তব্যে ভবিষ্যতে ভারতে সিন্ধু প্রদেশ (পড়ুন 'পাকিস্তান') যুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে যুদ্ধের 'সম্ভাবনা', 'হিটলারি-তন্ত্র' ইত্যাদি বিষয়ে চেনা ছকে অবাধে বিচরণ করেছেন তিনি সেই সম্পাদকীয়তে।

তাহলে মোদ্দা বিষয় কী দাঁড়াচ্ছে, তত্ত্বগতভাবে ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যাবে উপ-জাতীয়তাবাদকে শিখণ্ডী খাড়া করে। অথচ তত্ত্বগতভাবে ভারতকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জুড়তে দেওয়া যাবে না কোনোমতেই। মজার ব্যাপার, বঙ্গের বৌদ্ধিক জগতে রবীন্দ্রনাথ কিছু লোকের একচেটিয়া সম্পত্তি। আর তাঁরাই বঙ্গের মানুষের রুচি-সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন নিজেদের কায়েমি স্বার্থে। এবার দেশের স্বার্থে এই মনোপলির অবসান দরকার। □

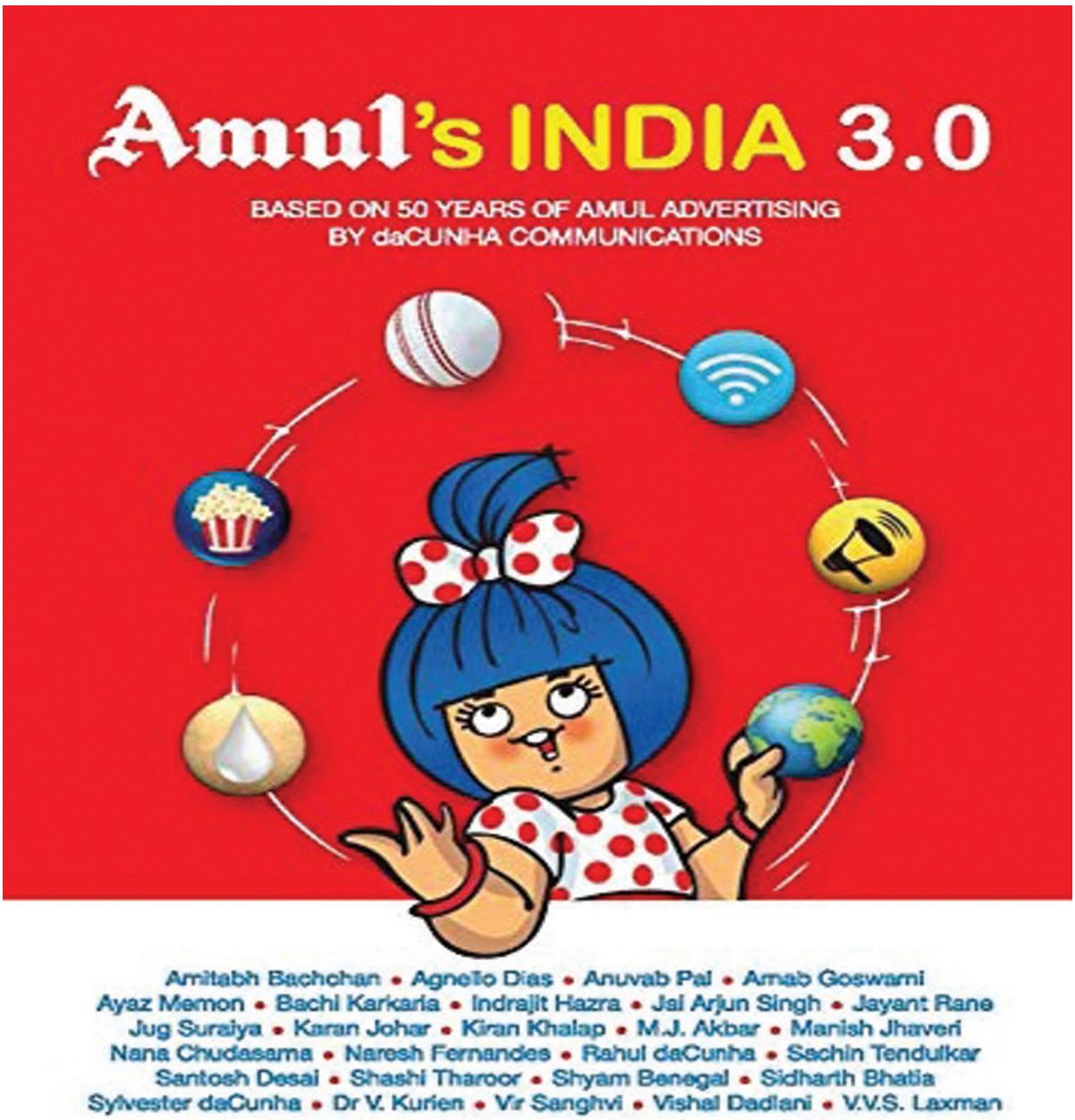

পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির জন্মদাতা কমিউনিস্টরা

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনোত্তর তিয়াত্তর বছরের প্রায় পুরো সময় জুড়ে তারা রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার। রাজনৈতিক দ্বিচারিতা এবং দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থকে একমাত্র গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাজ্যের ও মানুষের চরম ক্ষতি হয়ে এখন পুরো রাজ্যটাই এক হতভাগ্য রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

প্রফুল্ল ঘোষ ও বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ে রাজনৈতিক সততার ব্যত্যয় বিশেষ হয়নি। বরঞ্চ বলা যায় নেহরু ও অন্য অনেকের সঙ্গে লড়াই করে তিনি পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং যেসব পরিকল্পনা করেছিলেন তারই ফসল এই রাজ্যবাসী পাচ্ছে। নেহরুর পছন্দ নয় এমন প্রজেক্টও বিধান রায় নিজের ক্যারিশ্মা ও বাকচাতুর্যে বের করে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দুই ধরনের সততাই প্রশ্নাতীত। কিন্তু তারপর প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দেশের রাজনীতিতে বড়ো বড়ো ঘটনা, যেমন— চীনের সঙ্গে যুদ্ধে হার, নেহরুর বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা, তাসখন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীজীর অকালমৃত্যু, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল, ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উত্থান। অন্যদিকে রাজ্যে বিধানচন্দ্র রায়ের মতো একজন অত্যন্ত সফল মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে প্রত্যাশার সুউচ্চ চূড়া। ব্যক্তিগতভাবে সৎ কিন্তু প্রশাসনিকভাবে দুর্বল প্রফুল্ল সেনের দুর্বলতার সুযোগ পুরোপুরি ভাবে নিয়ে নিল কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্ট দলগুলি যখন রাজ্যে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে নামে,

> যতদিন তারা পশ্চিমবঙ্গের শাসনের দায়িত্বে ছিল, বামফ্রন্টের নামাবলী গায়ে রেখে সিপিএম একদলীয় শাসন চালিয়ে গেছে। আর তাদের ক্ষমতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থাও রাজ্যে অস্তমিত।

তখন থেকেই মুখ ও মুখোশের রাজনীতি শুরু হলো। মুখে জনগণের হাতে অধিক ক্ষমতার লড়াই, আসলে ছলে-বলে-কৌশলে রাজ্য-রাজনীতির দখল নেওয়া। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কারণে-অকারণে হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন— যা স্বাধীনতাপূর্ব যুগের হিন্দু নিধনের পরবর্তী সময়ে মানুষ দেখেনি, তা ফিরে এলো। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় নাগাদ কলকাতায় ক্ষণস্থায়ী মুসলমান দাঙ্গার সময় থেকে কমিউনিস্টরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ ও মৌখিক আশ্বাসের ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্কে তাদের জুড়ে নিতে সমর্থ হলো। কারণে-অকারণে জঙ্গি আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে ওই সময় থেকেই শুরু হয়, যার চালিকাশক্তি ও নেতৃত্ব দুইই ছিল কমিউনিস্টদের হাতে। ট্রাম ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতা শহর জুড়ে ট্রাম বাস পুড়িয়ে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের জনকও এই কমিউনিস্টরা। এরপর 'খাদ্য আন্দোলন' আরকেটি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। উদ্দেশ্য মানুষের ভালো করা নয়, নিজেদের ক্ষমতা দেখানো ও একইসঙ্গে অখুশি জনসাধারণের ভোট নিজেদের দিকে টেনে রাজ্যের ক্ষমতা দখল। এই সময় কোনো 'ইজম'-এর লড়াই ছিল না। সে লড়াই থাকলে ব্যক্তিগত কুৎসা করা হয় না। এখানে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই এটি করে থাকে। এক সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে 'তোজোর কুকুর' বলা কমিউনিস্টদের চরিত্র কখনো বদলায় না। এই সময় রাজ্য কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র এক সময় বলেছিলেন, 'আমি ভদ্রলোক নই, আমি কমিউনিস্ট'। একজন প্রবীণ কমিউনিস্টের এই স্বীকারোক্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ভদ্রলোকের রাজনীতির বিপরীতধর্মী রাজনীতি করে কমিউনিস্টরা।

যাক সেসব কথা। প্রফুল্ল সেনের নামে চারিত্রিক ও মিথ্যা কুৎসা রটানো (যেমন তিনি নাকি স্টিফেন হাউসের মালিক) রটনা করেও কমিউনিস্টরা ১৯৭৬-এর সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৮০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬৩টি আসন দখল করতে পারে। নিজেদের ক্ষমতায় হবে না বুঝতে পেরে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তের মতো নেতারা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে

'যুক্তফ্রন্ট' হিসেবে ক্ষমতায় আসে। এর পরেই কমিউনিস্ট সুলভ অসহিষ্ণুতা ও নেতাদের দাম্ভিকতার কারণে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির সঙ্গে তাদের সংঘাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। অজয় মুখার্জিকে সরিয়ে জ্যোতি বসুকে মুখ্যমন্ত্রী করার গোপন অ্যাজেন্ডা তখন অগ্রাধিকার পাচ্ছিল। এরপর ১৯৬৮-র শুরুতে এই অচল সরকারকে বরখাস্ত করা হলো। কংগ্রেসের এই হঠকারী রাজনীতির খেসারত আজও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ দিয়ে চলেছে। কমিউনিস্টরা তাদের গোপন অ্যাজেন্ডার কুপ্রভাব জনগণের মধ্যে পড়ার আগেই বরখাস্ত হওয়ায় বাঙ্গালি জাত্যভিমানে আঘাত লেগেছে বলে শোরগোল তুলল, কেন্দ্রের কংগ্রেসি সরকার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে সেই ফাঁদে পা দিল। ফলে, ১৯৬৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলো। তখন কমিউনিস্টদের প্রয়োজন ছিল সহযোগী দলগুলি বিশেষত বাংলা কংগ্রেসকে শেষ করা। এই hidden অ্যাজেন্ডা নিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ নিল। অজয় মুখার্জি নামমাত্র মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন। গুরুত্বপূর্ণ সব দপ্তর কমিউনিস্টদের হাতে গেল। এখান থেকেই কোয়ালিশন রাজনীতিতে কোয়ালিশন পার্টনারদের রাজনৈতিকভাবে খতম করার রাজনীতি শুরু হয়। যদিও মমতা ব্যানার্জি অনেক দৃষ্টিকটু পদ্ধতিতে একই কাজ করেন। যাই হোক, বাংলা কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি মেদিনীপুরে কমিউনস্টরা বাংলা কংগ্রেসের সংগঠন ভেঙে নিজেদের সংগঠন গড়তে লাগল। অবশ্যই রাজনৈতিক শিষ্টাচার বিসর্জন দিয়ে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সাত মাসের মাথায় বরখাস্ত করলেও পরের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা তেরো মাস চলেছিল। এই মন্ত্রীসভার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো, শরিক দলগুলির মধ্যে মারামারি, সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট দল বাইরে থেকে এই মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করলেও সিপিএমের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। পুলিশকে দলদাস বানানোর কৌশল এই সময়েই পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে ও পার্টির কর্তা প্রমোদ দাশগুপ্তের প্ররোচনায় শুরু হয়। প্রথমবার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় অজয় মুখার্জি সিপিএমের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগ করলে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা আরও পাঁচ মাস চলে। এই সময় সিপিএমের দাদাগিরি, তাদের দ্বারা প্ররোচিত শ্রমিক অসন্তোষ, আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে।

> নিজের দলের ভোটে থাবা বসাতে পারে এমন দলগুলিকে marginalize করা গেলে এরা সিপিএমের সব দাদাগিরি মেনে নেবে ও প্রান্তিক শাসকদল হিসেবে এক আধখানা পোস্ট পেলেই খুশি থাকবে। এদের সংগঠনগুলোকে প্রথমেই ভেঙে দিতে হবে যাতে তারা পুরোপুরি সিপিএমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটাই সিপিএমের তত্ত্ব।

একই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, যার প্রভাব এই রাজ্যের রাজনীতিতেও পড়ে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোয় সিনিয়র কংগ্রেসি নেতাদের তাড়িয়ে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস ভেঙে দিলেন। ইন্দিরা কংগ্রেস হলো কংগ্রেস (আর) ও আদি নেতাদের কংগ্রেস হলো কংগ্রেস (ও)। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও এই ভাগ হলো। নেতাভিত্তিক কমিউনিস্ট দলগুলি হার্ড লাইন থেকে সফ্‌ট লাইন নিয়ে সোশ্যালিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটের নামাবলী গায়ে দিল। এই সময় ভারতের রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজ্যের রাজনীতিতে জ্যোতি বসু সবচেয়ে বাস্তবাদী নেতা হিসেবে নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হলেন। দুর্জনে বলে, দুজনের একটি অলিখিত আঁতাত ছিল। সিপিআই ছিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গ-লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা হিসেবে। আর লেফট ফ্রন্টের নেতৃত্বে সিপিএম। ফরোয়ার্ড ব্লক সিপিআই-এর সঙ্গে তো বাংলা কংগ্রেস ভেঙে একাংশ সিপিএমের সঙ্গে। অদ্ভুত একটি খিচুড়ি। নীতি আদর্শের বালাই নেই। ক্ষমতা দখলই একদিকে কমিউনিস্টদের অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধীর একমাত্র মোক্ষ। এর মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। সিপিএমের ভরসা তাদের বিপক্ষ নেতাদের চরিত্র হননকারী প্রচার ও পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। সিপিএমের এই সময়ের একটি স্লোগান ছিল 'দিল্লি থেকে আসলো গাই, সঙ্গে বাছুর সিপিআই'। প্রসঙ্গত, এই সময় কংগ্রেসের প্রতীক ছিল গাই-বাছুর। আজকে সিপিএম ধিকৃত হওয়ার পরে অনেক বড়ো বড়ো নীতির কথা বলছে, ওই সময় কলকাতা আর তার আশেপাশের দেওয়াল ভরে গিয়েছিল একটি কার্টুন পোস্টারে— নখ থেকে রক্ত ঝরা এক ডাইনি যার মুখের আদল ইন্দিরা গান্ধীর— সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ স্লোগান। মনে রাখা দরকার, ওই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

এই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা চলল ১৬ মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত। তারপর আবার রাষ্ট্রপতির শাসন। সিপিএম একদিকে মন্ত্রিত্ব চালাতে দিচ্ছিল না, আবার অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির বিরুদ্ধে বাংলা বনধ ডেকে গাড়ি পোড়ানো, দোকান ভাঙচুর, বোমমারা ইত্যাদির মারফত নিজেদের শক্তি জাহির করতে লাগল। এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি কিন্তু কমিউনিস্টদের সৃষ্ট। ১৭ মার্চ ১৯৭০ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা ছিল। আগেরদিন রাতে সেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হলো— বনধ সফল করতে। এই সময় রাজ্যের রাজনীতিতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক উন্মোচিত হলো। একদল শিক্ষিত যুবক যারা কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিল, তারা মুখের পেছনে কমিউনিস্ট রাজনীতিকদের মুখোশের আড়ালের মুখটা দেখে সোশ্যাল ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস হারিয়ে 'বন্দুকের

নলই ক্ষমতার উৎস', 'ধনীর পিঠের চামড়া দিয়ে গরিবের পায়ের জুতো তৈরি হবে' ইত্যাদি অবাস্তব স্লোগান দিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হলো। এদের বহুল পরিচিত রাজনীতির নাম হলো এরা নকশাল। নকশালবাড়ি থেকে আন্দোলনের উৎপত্তি হেতু এই নাম। এদের মধ্যে আমি তিনজন নেতার নাম করি--- সর্বাধিনায়ক চারু মজুমদার, ছাত্রনেতা ও কৃষকনেতা অসীম চট্টোপাধ্যায়, ছাত্রনেতা ও পরবর্তীকালে চাকরিজীবনে আমার সহকর্মী শৈবাল মিত্র। এই আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত পৈশাচিক পদ্ধতিতে সিদ্ধার্থশংকর রায় দমন করেন এবং সাধারণ মানুষের ঘৃণা কুড়ান। এটা ঠিক যে এই শিক্ষিত যুবকরা ছিল বিপথগামী। খুনের রাজনীতি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু আজ মানুষের যে কথা জানার অধিকার আছে তা হলো এদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব যাদের, সেই কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব এদের মাঝে মাঝে ক্ষেত্র বিশেষে তোল্লা দিয়েছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তারপর সময় ফুরোলে নিকেশ করেছে। এই সময় প্রথম রাজ্যের পুলিশকে দিয়ে রাজনৈতিক খুন করানো শুরু হয়। ফল, আজ পশ্চিমবঙ্গে যে কাজটা institutionalized তার জনক জ্যোতি বসু ও সিদ্ধার্থশংকর রায়।

১৯৭১-এর নির্বাচনে আবার খিচুড়ি সরকার ফিরে এলো। অজয় মুখার্জি আবার মুখ্যমন্ত্রী হলেন। ইতিমধ্যে সিপিএম ধীরে ধীরে প্রতি নির্বাচনে আসন সংখ্যা বাড়াচ্ছে এবং তার সমগঠনের দাদাগিরির উপর আস্থা বাড়াতে পেরেছে। ফল, শরিকি সংঘাত আরও বাড়ল। দুটি মাত্র বড়ো দল আসন সংখ্যার বিচারে সামনে এলো। কংগ্রেস (আর) অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেস ও সিপিএম। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলি হলো বাংলা কংগ্রেস ও সিপিআই। সিপিএম ও কংগ্রেসের নীতিহীন আগ্রাসী তত্ত্বের জয় হলো। পরাজিত হলো সাধারণ মানুষের চাহিদা ও সুশাসনের অধিকার।

এই সরকার তিন মাসের মধ্যে বরখাস্ত করে ইন্দিরা গান্ধী তার কংগ্রেসের শাসন কায়েম করতে সচেষ্ট হলেন। ১৯৭১-এর পাকিস্তানের উপর জয়, শক্তিশালী পররাষ্ট্র নীতি এবং ওই সময় আমেরিকা বিরোধী জোটে ভারতের অবস্থান মানুষের মনে আমেরিকা ও পাকিস্তান বিরোধী বামপন্থী চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। অবশ্যই কমিউনিস্ট প্রচার এতে সাহায্য করেছে। এরপর ১৯৭২-এ রাজ্যে নির্বাচন হলে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রেটের মুখোশ পরা ইন্দিরা গান্ধীর দলকে মানুষ নির্বাচনে জেতাল। ১৯৭২-এর নির্বাচনকে সর্বৈব রিগিং আখ্যা দিয়ে সিপিএম ব্যাপক প্রচার চালালেও সঠিক হিসেবে ৩০টির মতো আসনে আংশিক রিগিং হয়। কিন্তু সিপিএম তার উন্নত প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে এই 'রিগিং' মতবাদ অনেকাংশে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

কংগ্রেসের অপশাসন, নকশালি হামলা, ও তার পৈশাচিক ভাবে দমন, তদুপরি জরুরি অবস্থার সময় নাগরিক অধিকার হরণ, সমাজবিরোধীদেরল রাজনৈতিক স্তরে ক্ষমতার অলিন্দে আরোহন, এই সব কারণে এবং সারা দেশব্যাপী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিরোধী ঐক্য ও সমন্বয় গড়ে তোলা ইত্যাদি কারণে ১৯৭৭-এ বিরোধী দল হিসেবে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে।

সিপিএম আগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে, নিজের দলের ভোটে থাবা বসাতে পারে এমন দলগুলিকে marginalize করা গেলে এরা সিপিএমের সব দাদাগিরি মেনে নেবে ও প্রান্তিক শাসকদল হিসেবে এক আধখানা পোস্ট পেলেই খুশি থাকবে। এদের সংগঠনগুলোকে প্রথমেই ভেঙে দিতে হবে যাতে তারা পুরোপুরি সিপিএমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আগের নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস ও সিপিআই। সেজন্য যতদিন তারা পশ্চিমবঙ্গের শাসনের দায়িত্বে ছিল, বামফ্রন্টের নামাবলী গায়ে রেখে সিপিএম একদলীয় শাসন চালিয়ে গেছে। আর তাদের ক্ষমতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থাও রাজ্যে অস্তমিত। □

শোক সংবাদ

বর্ধমান নগরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক দিলীপ দে গত ১৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। ছাত্রাবস্থায় তিনি সঙ্ঘের

স্বয়ংসেবক হন। বর্ধমান পলিটেকনিক কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করে চিত্তরঞ্জন থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি বিএসসি পাশ করেন। বর্ধমান নগরে শাখার মুখ্যশিক্ষক, কার্যবাহ, নগর কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি প্রচাকর হন। আসানসোল নগর প্রচারক, জেলা প্রচারক, নদীয়া জেলা প্রচারক, কলকাতা মহানগর প্রচারক এবং প্রান্ত শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখের দায়িত্ব পালন করে ২০০৩ সালে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়িতে ভারতমাতার বিগ্রহ রয়েছে। নিত্য পূজা হয়।

- - - -

বর্ধমান নগরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক কৃষ্ণব্রত পাঁজার মাতৃদেবী কমলা পাঁজা গত ২২ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, কৃষ্ণব্রত পাঁজা ১৬ বছর সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন।

কৃষিবিল, কৃষক আন্দোলন বাস্তবতা বনাম ষড়যন্ত্র

কল্যাণ গৌতম

সম্প্রতি কৃষি বিষয়ক তিনটি বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ ও উত্তীর্ণ হয়ে, মহামহিম রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে আইনরূপে বলবৎ হয়েছে। ১. কৃষি পণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি) আইন, ২. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা আইন এবং ৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংধোনী) আইন।

কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য আইনের ফলে এমন একটি ইকোসিস্টেম বা তন্ত্র রচনার বন্দোবস্ত হচ্ছে যেখানে কৃষক ও ব্যবসায়ী কৃষিপণ্যের ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত স্বাধীনতা ভোগ করবে। মান্ডিতে ফসল বিক্রি করতে গিয়ে যদি কৃষক মনে করেন তিনি প্রতারিত হচ্ছেন, যথাযথ দাম পাচ্ছেন না, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা তার জন্য খুলে থাকছে। প্রতিযোগিতার এক নতুন ও অন্যতর মার্কেটিং চ্যানেল তৈরি হচ্ছে। দক্ষ, স্বচ্ছ, বাঁধাহীন হচ্ছে এই প্রণালী। কৃষিপণ্যে অন্তর্রাজ্য ও আন্তর্রাজ্যের বাণিজ্য সম্ভব হবে। দৃশ্যমান বাজারের বাইরেও বাজার-সদৃশ্যস্থল রচনা হবে। সম্ভব হবে বৈদ্যুতিন বাণিজ্য। আইনের মূল লক্ষ্যটি হলো, সারা দেশের জন্য সসংহত ও অভিন্ন একটি বাজার

গড়ে তোলা— 'এক দেশ এক হাট'। কেন্দ্র সরকার চাইছেন না কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কাটমানি-খোর মধ্যস্বত্বভোগী এঁটুলি পোকার মতো লাভের গুড় খেয়ে যাক। নতুন আইনে কৃষক ফসল থেকে বেশি দাম পাবেন, লাভবান হবেন। তেমনই সাধারণ মানুষ কমদামে ফসল কিনতে পেরে লাভবান হবেন। অর্থাৎ এটি যেমন কৃষক-বান্ধব আইন, তেমনই সাধারণ মানুষের উপযোগী আইন। তবে দালালদের সন্তুষ্টির আইন এটি নয়। কৃষিতে লাভ হয় না বলে যে কৃষক চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন, তার

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মতো ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প থেকে কেন এ রাজ্যের চাষিরা বঞ্চিত হচ্ছেন? সারা দেশের কৃষক যেখানে বারো হাজার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে গেছেন, এ রাজ্যের চাষিরা তা আজও পেলেন না। কেন্দ্র সরকার চায় চাষির অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে। ব্যাঙ্কে টাকা সরাসরি গেলে কাটমানির সুযোগ মিলবে না, তাই কি রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে সামিল হয়নি— অভিযোগ কিন্তু উঠছে।

বিপ্রতীপে এই আইন কৃষককে জমি-জিরেতের অভিমুখী করে তুলবে। মান্ডিতে বিক্রি করার জন্য যে শুল্ক লাগতো, এখন থেকে তা আর লাগবে না। কেউ যদি মনে করেন, তিনি লেভি দিয়ে মান্ডিতেই ফসল বিক্রি করবেন, তার সুযোগ বঞ্চিত হচ্ছে না। অর্থাৎ যারা বলছেন, মান্ডি উঠে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষি সুরক্ষা আইন হলো চাষের চুক্তি সংক্রান্ত একটি জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক। কৃষককে ক্ষমতাশালী করাই তার লক্ষ্য। কৃষি এক শিল্পের পর্যায়ে যাচ্ছে, একটি ভৌমশিল্প যেন! এখন থেকে ব্যবসায় জড়িত হবেন কৃষক। জড়িত হবেন ব্যবসায়ী ফার্মের সঙ্গে, প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির সঙ্গে, পাইকারি বিক্রেতার সঙ্গে, কিংবা খুচরো ব্যবসায়ীর সঙ্গে। চুক্তির ব্যাপারটা আসছে ফসল পাকার পর, কেবলমাত্র উৎপাদিত

পণ্য বিক্রির জন্য। এটি আদৌ জমির বন্ধক সংক্রান্ত কোনো চুক্তি নয়। কখনই জমি হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা নেই আইনের ভাষায়। একেবারে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন একটি পদ্ধতির কথা আছে। কৃষকের লাভজনক দাম পাবার কথা আছে। চাষের শুরুতেই কৃষক লাভের ব্যাপারে স্থিরচিত্ত হতে পারবেন এই আইনে।

তৃতীয়ত, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইনে বলা হয়েছে যে কেন্দ্র সরকার কেবলমাত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সহসা ও মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হলে তবেই খাদ্যশস্য, ডালশস্য, আলু, তৈলবীজ ও পেঁয়াজের মতো কৃষিপণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। পচনশীল ও অপচনশীল কৃষি-উদ্যান ফসলের দাম কত শতাংশ বৃদ্ধি পেলে সরকার মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কীভাবে তা করবে, তা সুস্পষ্ট বলা আছে এই আইনে। কোনোভাবেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বেলাগাম আইন এটি নয়। সিমেন্ট, ইস্পাতও পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় আইনের আওতার বাইরে চলে গেছে, তাতে মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে কিন্তু ইস্পাত ও সিমেন্ট যায়নি। ১৯৫৫ সালে যখন এই আইন লাগু হয় তখন আজকের মতো কৃষি উন্নয়নের পরিস্থিতি ছিল না। আজ দেশে কৃষি উৎপাদন ও তার হার অনেক বেড়েছে। দেশ আজ কৃষিতে সাবলম্বী। তাই ৬৫ বছর আগেকার কৃষি-নীতি আজকের নীতি হতে পারে না। নতুন আইনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্য থেকে আয়ের সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, তেমনই দেশে সংরক্ষণ ও শস্যাগার নির্মাণ শিল্পের সুযোগ বাড়বে। ফসলের অপচয় রোধ করাও সম্ভব হবে। কিন্তু বিল পেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু করে দিল মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বিরোধী দলগুলি। বিরোধিতা গণতন্ত্রের পক্ষে সুলক্ষণ। তবে এই বিরোধিতার যুক্তি ও ধরণ কিন্তু আলাদা। আন্দোলনে কাদের মুখ দেখা যাচ্ছে, তাদের রণকৌশল কী, স্লোগান কী, ব্যানার-পোস্টারে কী লেখা যাচ্ছে— সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, ভারত-বিরোধী নানান বিচ্ছিন্নতাবাদী, শক্তি অন্তরালে থেকে কিছু কৃষককে সামনে এগিয়ে দিয়েছে। এরা মোটেই সামগ্রিক কৃষকের যথার্থ প্রতিভূ নয়। যারা এতদিন বাজার-দালালী করে কৃষকের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসলে নিজেদের পরিপুষ্টি ঘটাতো, কাটমানিতে ফুলেফেঁপে উঠতো, তাদেরই একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস হচ্ছে এই আন্দোলন। তা দেশের কৃষকের নামে চালানো অন্যায়। আন্দোলনের নামে অসত্য ও অর্ধসত্য বিবৃতি দেওয়াও অপরাধ।

বিরোধীদের জবাবে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন এই বিল চাষিকে বীজ বোনার সময়েই ফসলের দামের গ্যারান্টি দেবে। বিক্রয় চুক্তি কেবলমাত্র উৎপাদনের উপর, তার সঙ্গে কৃষিজমির কোনো উল্লেখ নেই। কৃষক চুক্তি থেকে সরে আসতে পারে, ব্যবসায়ী পারবে না, কৃষক ও তার কৃষিজমি পুরোপুরি সুরক্ষিত। তিনি বিরোধীদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, কোনোদিনই কি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনের অঙ্গ ছিল? কংগ্রেস তো ৫০ বছর শাসন করেছে। তারা কেন এতদিন তা আইনের অঙ্গীভূত করল না? বিরোধীরা কৃষিবিলকে রাজনৈতিক ইস্যু করেছে, যেহেতু এই বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনার আর কোনো জায়গা নেই। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সবসময় ভারত সরকারের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই ছিল এবং থাকবে। নতুন আইনে কৃষক দেশ জুড়ে যে কোনো কৃষিজ পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এই আইন কৃষককে পণ্য বিক্রির সুযোগ বাড়াতে সহায়তা দেবে। মান্ডি বা কৃষি-বাজারে যেভাবে কৃষকেরা আর্থিকভাবে শোষিত হয়, মানসিকভাবে প্রতারিত হয়, তা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করবে এই বিল। আন্দোলনকারীরা নাছোড়বান্দা। সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বারে বারে কথা বললেও, তারা আসলে সমাধান তারা চাইছেন না। দেশে আন্দোলনের নামে অস্থিরতা জিইয়ে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই প্রশ্ন উঠেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেছে কিনা। যে দাবি মঞ্চে খালিস্তানপন্থী, নকশালবাদী, উগ্র কাশ্মীরি, শাহীনবাগ এবং ভারতবিরোধী মুসলমান নেতাদের দেখা যায়! যে আন্দোলন চলাকালীন স্লোগান ওঠে— 'মোদী তেরি কবর খুদেগী, আজ নেহি তো কাল!' ইন্দিরাকো ঠোক দিয়া, মোদী কেয়া হ্যাঁয়!' 'পাকিস্তান হামারা দুশমন নেহি হ্যায়, দিল্লি হামারা দুশমন হ্যায়!' 'কৃষি বিল ইজ অ্যান্টি শিং!' সেখানে যাবতীয় আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয় বৈকি! কৃষিবিল নিয়ে এই কট্টর বিরোধিতা কেনই বা কেবলমাত্র পঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো স্থানে জন্ম নিল! কেনই বা অবশিষ্ট ভারতে বাদ গেল? কেন যে অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন করলেন, তাদের গড় পারিবারিক আয় অন্য রাজ্যগুলি থেকে অনেক বেশি।

দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষকে ভাড়া করে সামনে এগিয়ে দিয়েছে আর একদল মানুষ! দামী গাড়ি ও এলাহি আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হওয়া মানুষ আসলে কারা? তারা কতশত বিঘা জমির মালিকানা ভোগ করেন? তারা কোনো মান্ডির আড়তদার? তারা কোনো বাজার কমিটিতে জাঁকিয়ে বসে থাকা রাজনৈতিক দলের প্রতিভূ? এসব চালচিত্র খুঁটিয়ে দেখতে হবে। খুঁজতে হবে বৈদেশিক যোগাযোগের তথ্যতালাশ। তখনই আবিষ্কার হবে এক অভূতপূর্ব ষড়যন্ত্রের আখ্যান, দেশবাসী নিশ্চিত।

তারপর যারা কৃষককে সম্মান দিতে জানেন না, তাদের কী হবে? প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মতো ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প কেন চালু করেনি পশ্চিবঙ্গ? তাতে কেন এ রাজ্যের চাষিরা বঞ্চিত হচ্ছেন? দেশবাসীর নজরে কিন্তু নেই, এ রাজ্যের সত্তর লক্ষ কৃষকের বছরে ছয় হাজার টাকা পাবার সুবিধা অধরাই থেকে যাচ্ছে। সারা দেশের কৃষক যেখানে বারো হাজার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে গেছেন, এ রাজ্যের চাষিরা তা আজও পেলেন না। কারণ রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে সামিল হয়নি। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' বললে, আর যে পুজোই হোক, ভোটপুজো চলে না। ব্যাঙ্কে টাকা সরাসরি গেলে কাটমানির সুযোগ মেলে না, মানুষের অভিজ্ঞতা এমনতরো। তাই কী রাজ্য সরকার চাইছে, তাদের মাধ্যমে কৃষককে টাকাটা দিতে হবে? এতবড়ো বঞ্চনার বিচার কবে হবে? কে কবে করবে এর বিচার? □

বিজয়ের মাসে পেছন ফিরে তাকাতেই হবে, আত্মত্যাগ ভোলা যাবে না

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ঢাকায় প্রতি বছর বিজয় দিবস উদযাপিত হয় মহাসমারোহে। ১৯৭১ সালের এই দিনে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে। তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডেরও অধিনায়ক ছিলেন। বাংলাদেশে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় (বাংলাদেশ সময়) তৎকালীন রেস কোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি তাঁর ৯৩ হাজার সেনা নিয়ে জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ দলিলে সই করার পর তিনি নতমস্তকে নিজের পিস্তল তুলে দেন অরোরার হাতে। এর আগে ভারত সরকার নিশ্চিত করেছিল, আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে জেনভো সনদ অনুযায়ী আচরণ করা হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে ভারত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তা দান, বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিল ভারত। সর্বাত্মক যুদ্ধে নামে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা বিমান হামলা চালানোর পর। সে যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র তেরো দিন। মুক্তিযোদ্ধাদের হতে প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তান ভারতকে শিক্ষা দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে যুদ্ধে জড়ানোর পরিকল্পনা করে, কিন্তু পাকিস্তানের সে কৌশল কার্যকর হয়নি। চীন অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো ছাড়া সেনা নিয়ে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে সোভিয়েত হুমকির মুখে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৫/৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভেঙে পড়ে, একের পর এক ঘাঁটির পতন ঘটে। অন্যদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনেও ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড গতিতে অনেক ভেতরে ঢুকে পড়ে, গুঁড়িয়ে দেয় পাক বিমানশক্তি। পাকিস্তান তাদের মুরুব্বিদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধে নেমেছিল এই কৌশলে যে, এক পর্যায়ে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

পাকিস্তানি সমরনায়করা পরবর্তীতে তাদের লেখা নানা গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, কার্যত পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। যুদ্ধ করার মানসিকতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালায়, কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে? সে রণাঙ্গণেও পাকিস্তানি বাহিনী পর্যুদস্ত হয়, ভারতীয় বাহিনীর অগ্রাভিযান রুখতে পারেনি। পাকিস্তানি সমরনায়করা আরও বলেছেন, ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল

শ্যাম মানেক'শ যখন ডিসেম্বরের ১০ তারিখের পর থেকে দুই রণাঙ্গনেই পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিতে থাকেন (হাতিয়ার ডাল দো) এবং সে নির্দেশ অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে বারবার প্রচারিত হতে থাকে, তাতে জেনারেল ইয়াহিয়া ঘাবড়ে যান। পশ্চিম রণাঙ্গন বাঁচাতে তিনি ১৩ তারিখেই পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়াজিকে আত্মসমর্পণে সম্মত হতে বলেন। তখন ঢাকার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ভারতীয় বাহিনী। পাকিস্তানের বিমান শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগুন জ্বলছে, ভারতের বিমানবাহী রণতরী 'বিক্রান্ত' বাংলাদেশের উপকূলে।

ইয়াহিয়া খান ভেঙে পড়লেও নিয়াজি শেষ রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি ১৪ তারিখে সকালে ছুটে যান মার্কিন উপরাষ্ট্রদূতের কাছে। অনুরোধ জানান, যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করতে। মার্কিন উপরাষ্ট্রদূত নিয়াজিকে বলেন, তিনি ভারত সরকারের কাছে শুধু লিখিত অনুরোধ পত্র পৌঁছে দিতে পারেন। এর বেশি কিছু মার্কিন সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। হতাশ হয়ে ফিরে যান নিয়াজি। এরই মধ্যে ঢাকার উপকণ্ঠে ভারতীয় ছত্রী সেনা নেমে গেছে, ট্যাংক বহর ঢুকে পড়েছে। ঢাকা ঘেরাও হয়ে পড়েছে চারদিকে। মেজর জেনারেল গন্দর্ভ সিংহ নাগরা তাঁর বাহিনী নিয়ে মীরপুর সেতুর কাছে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন।

ঢাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা সদর দপ্তরে একসঙ্গে বসে বৈঠক করছিলেন ১৫ তারিখ থেকে। বৈঠকে ছিলেন লেফট্যানেন্ট জেনারেল এ.কে. নিয়াজি, মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি, রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ, ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী, সিদ্দিক সালিক এবং আরও কয়েকজন। ১৬ তারিখ সকালে এক চিরকুট এসে পৌঁছালো নিয়াজির কাছে। চিরকুটে লেখা ছিল, প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মীরপুর সেতুতে। আপনার প্রতিনিধি পাঠান। এখানে 'আবদুল্লাহ' বলতে জেনারেল নিয়াজিকে বোঝানো হয়েছিল। নিয়াজির পুরো নাম আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি, যিনি এ.কে নিয়াজি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এ চিঠি পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল গন্দর্ভ সিংহ নাগরা। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান ভেবেছিলেন যুদ্ধবিরতির জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল নাগরা। তিনি জেনারেল নিয়াজিকে প্রশ্ন করেন, তিনি (জেনারেল নাগরা) কি আলোচনার জন্য এসেছেন? কিন্তু নিয়াজি সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। কারণ এর আগে পাকিস্তানের তরফ থেকে ভারতের কাছে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। ভারত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

তখন সেনানিবাসে এসব ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক। তার লেখা 'উইটনেস' বইতে তখনকার ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এছাড়া সেই সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে বই লিখেছেন রাও ফরমান আলি খান। তার লেখা বই 'হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড' বইতেও বিষয়গুলো উঠে এসেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর আরেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান। তিনি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বেসামরিক প্রশাসন দেখাশুনা করতেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কোনোভাবে যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সে ব্যাপারে ভারত সচেতন ছিল।... ভারতের ইস্টার্ন কমান্ড ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস পালন করে। বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি, সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধার প্রতিনিধি দল সে অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই যোগদান করেন।

মেজর জেনারেল নাগর ওই চিরকুটে সরাসরি আত্মসমর্পণের কথা বলন। নিয়াজি সরাসরি 'না' করে দেন। উইটনেস টু সারেন্ডার বইতে সিদ্দিক মালিক লিকেচেন, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি এবং রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ একসঙ্গে বলেন, জেনারেল নাগরা যা বলছে সেটাই করুন। এরপর জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠানো হয়।

সে মুহূর্তটিকে সিদ্দিক মালিক বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'ভারতীয় জেনারেল হাতে গোনা সৈন্য এবং গর্বিত পদক্ষেপে ঢাকায় প্রবেশ করেন। তখনই কার্যত ঢাকার পতন হয়ে যায়। জেনারেল নাগরা যখন ঢাকায় প্রবেশ করলেন তখন পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের অনেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন।'

এদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড অফিস থেকে যুদ্ধের রণকৌশল চিহ্নিত করার জন্য মানচিত্রগুলো সরিয়ে ফেলা হচ্ছিল। ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের আগমন উপলক্ষ্যে বাড়তি খাবারের আয়োজন চলছিল। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান সে মুহূর্তের বর্ণনা তুলে ধরেছেন এভাবে, 'জেনারেল নিয়াজির অফিসের ভেতরকার অবস্থা 'ভীতিবিহ্বল' করেছিল তাকে। জেনারেল নিয়াজি তার চেয়ারে বসে আছেন, তার সামনে জেনারেল নাগরা রয়েছেন এবং একজন জেনারেলের পোশাকে রয়েছেন যুক্তিবাহিনীর টাইগার সিদ্দিকীও (কাদের সিদ্দিকী)। শুনলাম নিয়াজি নাগরাকে জিজ্ঞেস করছেন তিনি উর্দু কবিতা বোঝেন কিনা। জবাবে নাগরা জানালেন যে, তিনি লাহোর সরকারি কলেজ থেকে ফার্সিতে এমএ পাশ করেছেন। নাগরা যেহেতু নিয়াজির চেয়ে বেশি শিক্ষিত ছিলেন, নিয়াজি তাই পঞ্জাবিতে রসিকতা শুরু করলেন। নিয়াজি মনের ভার কমাতে তার আগের চরিত্র ফিরে গেলেন।'

ইতোমধ্যে ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের লে. জেনারেল জে আর জ্যাকব ঢাকায় অবতরণ করেছেন। তিনি সঙ্গে এনেছেন

আত্মসমর্পণের দলিল। জেনারেল জ্যাকব যখন আত্মসমর্পণের শর্তযুক্ত কাগজ হস্তান্তর করলেন, তখন জেনারেল রাও ফরমান আলি একটি ধারা নিয়ে আপত্তি তুললেন। রাও ফরমান আলি আত্মসমর্পণের দলিলটি পড়ে বললেন, এটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো এখানে আত্মসমর্পণের কথা বলা হবে না। দলিলে বলা ছিল 'ভারতীয় যৌথ কমান্ড এবং বাংলাদেশ বাহিনীর' কাছে আত্মসমর্পণ করছে পাকিস্তান বাহিনী। বাংলাদেশ শব্দটি রাখতে চায়নি পাকিস্তানিরা। কিন্তু জেনারেল জ্যাকব বললেন, দিল্লি থেকে বিষয়টি এভাবেই এসেছে। তাঁর কিছুই করার নেই। তখন জেনারেল জ্যাকবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার কর্নেল খেরা।

নিয়াজি শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে রাজি হয়ে চেষ্টা করলেন আত্মসমর্পণ যেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে হয়। কিন্তু ভারত সম্মত হয়নি। এর পর চেষ্টা করেন আত্মসমর্পণ যেন সেনা দপ্তরে হয়, প্রকাশ্যে নয়। তাতেও জ্যাকব ও নাগরা রাজি হননি, তাদের কথা দিল্লির নির্দেশ আত্মসমর্পণ প্রকাশ্যে হবে। তাদের কিছুই করার নেই। অতঃপর জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের শর্তযুক্ত কাগজটি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

অনন্যোপায় জেনারেল নিয়াজি দুপুরের পর ঢাকা বিমানবন্দরে (পুরনো) গেলেন ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক জগজিৎ সিংহ অরোরাকে অভ্যর্থনা জানাতে। অরোরা তখন তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ততক্ষণে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিল। সিদ্দিক সালিক বর্ণনা করেন, জনসম্মুখে পাকিস্তানি জেনারেলের অপমান দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছিল।

অন্যদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধ থেমে যায়।

দুই

বাংলাদেশের বিজয় কীভাবে এসেছিল তার বর্ণনা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, ভারত সরকারের বাংলাদেশকে সমান মর্যাদায় সম্মানিত করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম আত্মত্যাগ ও সাহসের মর্যাদা দেওয়া — দুটি প্রস্তাবেই পাকিস্তান রাজি হয়নি। পাকিস্তান চেয়েছিল আত্মসমর্পণ হোক ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে এবং গোপন কোনো অনুষ্ঠানে। ভারত রাজি হয়নি, কারণ তাতে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো। বাংলাদেশের অদম্য মুক্তিবাহিনীর আত্মদানকে খাটো করা হতো।

দ্বিতীয়ত, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের অনুকূলে আনতে অনেক দেশ সফর করেন, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীনের হুমকি সত্ত্বেও বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নেন। বাংলাদেশের ৩০ লাখ শহিদের পাশাপাশি ভারতের কয়েক হাজার সৈন্যও মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়। শরণার্থীদের চাপ সামাল দিতে নতুন করের বোঝা বইতে হয় ভারতীয়দের। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে এ নিয়ে কোনো অসন্তোষ দেখা যায়নি। শরণার্থীদের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ছিল অপ্রতুল। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয়ত, ভারতের চাপেই কার্যত পাকিস্তান বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়, মুজিবকে ফাঁসির যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। মুজিবকে রাখা হয়েছিল লায়ালপুর কারাগারে। কবরও খোঁড়া হয়েছিল।

চতুর্থত, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়। বিশ্বে এ ধরনের কোনো নজির নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কোনোভাবে যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সে ব্যাপারে ভারত সচেতন ছিল।

বাংলাদেশ বিজয় দিবস পালন করে। ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডও ফোর্ট উইলিয়ামে দিবসটি পালন করে। বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি, সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধার প্রতিনিধি দল সে অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই যোগদান করেন।

কিন্তু বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে যে স্থানটিতে হানাদার বাহিনীর ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের আয়োজন হয়েছিল, সেই স্থানটি স্মরণীয় করে রাখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি সংগঠন সে স্থানে প্রতি বছরই বিজয়ের মাসে ফুল দেয়, আলোচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ইন্দিরা মঞ্চ স্থাপন করেছিলেন, যেখান থেকে বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ সফরে এসে ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ দেন। কিন্তু শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সে মঞ্চ ভেঙে দেন। কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধী ও জগজিৎ সিংহ অরোরার নামে ঢাকায় দুটি প্রধান সড়কের নামকরণের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি নেই। তবে ভারতের শহিদ জওয়ানদের স্মরণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর নামে একটি প্রধান সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। গত ১৭ ডিসেম্বর ভারত সরকার শেখ মুজিবের নামে ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর ইন্দিরা গান্ধী ও মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ভারতীয় সেনাদের সম্মানিত করেন। সম্মানিত করেন ভারতের সেইসব সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের, যারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্যান্য দেশের যারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের পাশে ছিলেন তাদেরও সম্মানিত করা হয়।

অভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ছাড়াও বাংলাদেশ-ভারতের বন্ধুত্বের প্রধান ভিত্তি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। বিজয় দিবস ও বিজয়ের মাস দুদেশের জনগণকে আরও কাছে টানতে পারলে দুদেশই লাভবান হবে। কারণ একাত্তরে সেই রক্তপাত, অসংখ্য মৃত্যু এবং ভ্রাতৃত্ববোধ যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে সুর কেটে যাওয়া বিপজ্জনক।

ভারতের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক অর্থনৈতিক— এ ধরনের মন্তব্য বিজয়ের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

নেতাজী সুভাষ, ড. শ্যামাপ্রসাদ এবং বীর সাভারকর

এক অন্বয় ব্যতিরেকী সম্পর্ক

বিনয়ভূষণ দাশ

ইদানীং কিছু সংবাদমাধ্যম এবং বাম-ঐশ্লামিক রাজনৈতিক দল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে হিন্দু মহাসভা এবং তাঁর নেতৃবর্গ বিশেষ করে ড. শ্যামাপ্রসাদ ও বীর সাভারকর-বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত করবার সযত্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা বলতে চাইছে, তাঁদের মধ্যে এত বিরোধিতা সত্ত্বেও বিজেপি কেন নেতাজীর ঐতিহ্য আত্মস্থ করতে চাইছে! মজার ব্যাপার হলো, যারা এক সময় নেতাজীকে তোজোর কুকুর, কুইসলিং ইত্যাদি সম্বোধনে গালাগাল করেছে, যে কংগ্রেসের প্রবাদপ্রতিম নেতা একসময় উদ্ধতস্বরে বলেছে, নেতাজী ফিরে এলে তিনি নিজে সুভাষকে ব্রিটিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন, গুলি করে মারবেন, আজ তাঁদেরই রাজনৈতিক উত্তরসূরিরা এবংবিধ হুঙ্কারব তুলেছে। কিন্তু বাস্তবে কি সত্যিই হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ এবং নেতাজীর মধ্যে অসেতুসম্ভব কোনো বিদ্বেষ ছিল? ইতিহাস কি তেমনই সাক্ষ্য দেয়? একথা অবশ্যই সত্যি যে, নেতাজী ও শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল এই বঙ্গপ্রদেশে। প্রথম পর্বের রাজনৈতিক জীবনে কলকাতা কর্পোরেশনকে ঘিরে কিছু মতান্তর, মনান্তর তাঁদের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের কোনো হানি হয়নি। কিন্তু এই বিষয়টিকেই সামনে এনে একে এক বিশাল মহীরুহের আকার দিয়েছে বামপন্থীরা। অবশ্য এ ব্যাপারে তাদের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাঙ্গলার রাজনীতি জটিল আকার ধারণ করে কংগ্রেসের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য। কংগ্রেস এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিকে মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য না করায় ফজলুল হক মুসলিম লিগের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হন। কংগ্রেসের এই অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে

বাঙ্গলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম পরীক্ষাতেই সাফল্য পেয়ে যায় মুসলিম লিগ। অপিচ, বাঙ্গলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দুরা ছিল অগ্রণী ভূমিকায়, কিন্তু মুসলিম লিগের শাসনব্যবস্থায় তাঁদের কার্যকরী ভূমিকা থাকল না। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে দেওয়া হলো। সেকেন্ডারি এডুকেশন বিলের মাধ্যমে শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে সেকেন্ডারি বোর্ডে এনে মুসলিম লিগের কর্তৃত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা পাকা করা হলো। লিগ প্রশাসন বাঙ্গলার হিন্দুদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত করে তুলল। যদিও তখন শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব পাঁচ শতাংশও নয়। এই ধরনের এক প্রেক্ষাপটে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসতে একপ্রকার বাধ্য হলেন। এই অবস্থার প্রতিরোধকল্পে শ্যামাপ্রসাদ তৎকালীন কংগ্রেসি নেতৃদ্বয় শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর ভাই সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে বাঙ্গলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করলেন। যদিও কংগ্রেস Communal Award অনুযায়ী হিন্দু ভোটেই নির্বাচিত হয়েছিল। তবুও, কামিনী রায়ের ভাষায়, 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে তৎকালীন বাঙ্গলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে ভয় পেত। ফলে কংগ্রেস এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হলো।

শ্যামাপ্রসাদ প্রথমেই বসু ভ্রাতৃদ্বয়, শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের কাছে গিয়ে মুসলিম লিগের অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই হিন্দুদের বাঁচাতে এগিয়ে এলেন না। বামপন্থীরা সুভাষের সঙ্গে

শ্যামাপ্রসাদের বিবাদের নানা গল্প ফেঁদে জনমানসে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টিতে মগ্ন। এই প্রসঙ্গে তাই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রথম মতান্তর ঘটে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। একটু পিছনে ফিরে দেখা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পক্ষ থেকে বাঙ্গালি মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) প্রস্তাব করা হয়। ওই প্রস্তাবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমানদের জন্য ৬০ শতাংশ ও হিন্দুদের জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া, মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকুরিতে ৫৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ ও যতদিন মোট ৫৫ শতাংশ পূরণ না হচ্ছে ততদিন ৮০ শতাংশ পদ মুসলমানদের দিয়ে পূরণ করা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়।

এই 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাঙ্গলার সমস্ত পুরসভায় কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, 'They have started by making appointments in the Corporation based on the communal principle, which all Indian nationalists condemn as fatal to the development of Indian nationhood.' দেশবন্ধুর এই 'বেঙ্গল প্যাক্টের' প্রস্তাবগুলিই সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে কার্যকরী করতে যত্নবান হন। কর্পোরেশনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৪০। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন, ১৯৩৭ অনুযায়ী। এই আইন অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৯ থেকে বাড়িয়ে ২২ করা হয়। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে।

উল্লেখ্য যে, সেই সময় কলকাতার হিন্দু জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ, করদাতাদের মধ্যে হিন্দু ৭৬ শতাংশ এবং হিন্দু ভোটদাতা ৮০ শতাংশ। কিন্তু শুধু হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসই নয়, নৌশের আলি, আবু হাসাইন সরকারের মতো মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দও এই বিলের বিরোধিতা করে। নৌশের আলি ঘোষণা করেন, 'এই বিল কোনো কাজেই আসবে না, পরন্তু কলকাতার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে।' অন্যদিকে আবু হাসাইন সরকার অভিযোগ করেন, এই বিল উর্দুভাষী, অবাঙ্গালি মুসলমান যেমন, ইরানি, সোহরাওয়ারদি, সিদ্দিকি, আদমজী ইত্যাদি অবাঙ্গালি মুসলমান যাঁদের পূর্বপুরুষ বাঙ্গলায় এসেছিল বাঙ্গলাকে শোষণ করার জন্য তাঁদেরই স্বার্থরক্ষা করবে। সুভাষ এই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কারণ ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরি কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হবার পরেও গান্ধীর বিরোধিতায় তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সুযোগে তিনি নিজের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। তিনি প্রথমে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে একটা সমঝোতা করেন। যদিও তিনি তখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছেন, তবু তিনি কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন নামে এক গোষ্ঠী গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সুভাষের জোট শুরুতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হিন্দু মহাসভা আগাগোড়াই কংগ্রেসের তোষণ নীতির বিরোধী ছিল। তাঁরা কংগ্রেসের নীতিকে দেশবিরোধী বলেই মনে করত। ফলে কংগ্রেসের সুবিধে হোক এটা তাঁরা কিছুতেই চাইতো না। সুভাষ তখন কংগ্রেসে না থাকলেও কংগ্রেসের স্বার্থে উদ্যোগ নিয়েছিলেন— যা তাঁকে মহাসভা বিরোধিতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। ১৯৪০-এর এই নির্বাচনে সুভাষগোষ্ঠী ২১টি, মুসলিম লিগ ১৮টি এবং হিন্দু মহাসভা ১৬টি আসন পায়। কিন্তু বোর্ড গঠনের সময় সুভাষ সমস্ত ন্যায়নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে সমঝোতা করে যা 'বসু-লিগ চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী লিগের প্রতিনিধি মেয়র এবং দুজন অল্ডারম্যান হবেন এবং সুভাষের গোষ্ঠী থেকে ডেপুটি মেয়র ও তিনজন অল্ডারম্যান হবেন। সেই শর্ত অনুযায়ী মুসলিম লিগের আব্দুর রহমান সিদ্দিকি মেয়র এবং সুভাষগোষ্ঠীর পিএন ব্রহ্ম ডেপুটি মেয়র হন। সুভাষ নিজে একজন অল্ডারম্যান হন। এইভাবে সুভাষের হাত ধরে মুসলিম লিগ কলকাতা কর্পোরেশনে ক্ষমতাসীন হয়।

বাঙ্গলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগ এইভাবে এক প্রাসঙ্গিক শক্তিতে পরিণত হয়। লিগ সুভাষ বসুকে কাজে লাগিয়ে বাঙ্গলার কংগ্রেসে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেস হাই কম্যান্ড সুভাষের তিক্ত সমালোচনা করে। হিন্দু মহাসভা এবং কলকাতার সংবাদ জগৎও সুভাষ বসুর তীব্র সমালোচনা করে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় সুভাষের বিরোধিতা করে লেখা হয়, 'he has walked into the parlour of the Muslim League which has humiliated the Congress and the Hindus।' এটা পরিষ্কার যে, এই ঘটনায় সুভাষ বসু মুসলমানদের সমর্থন অর্জন করেছিলেন হিন্দু এবং ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা খোয়ানোর বিনিময়ে। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র হিন্দু মহাসভা ও তার নেতা শ্যামাপ্রসাদেরও প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। প্রায় সমকালে সুভাষ মুসলমান সমর্থন সংহত করার তাগিদে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন শুরু করেন এবং সিরাজ-উদ-দৌল্লা হত্যা দিবসে টাউন হলে সিরাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করেন। এই মিটিঙেই মুসলিম লিগের ছাত্রশাখার তৎকালীন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অনেক সঙ্গীসাথীদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, সিরাজ-উদ-দৌল্লা ছিলেন এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অত্যাচারী, বিদেশি বংশোদ্ভূত নবাব। হিন্দু মহাসভা ও ড. শ্যামাপ্রসাদ এই ধরনের প্রতীকী পদক্ষেপে আস্থাবান ছিলেন না। এই সময়ে সুভাষ গান্ধী কর্তৃক কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়ে পরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেও তাঁর তখনও কংগ্রেসের প্রতি দুর্বলতা ছিল। হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের আবেদন- নিবেদনের নীতি এবং তোষণের পথ কখনই সমর্থন করেনি। হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে শ্যামাপ্রসাদ এবং সাভারকর ছিলেন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা, তাঁরা তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক লাভ লোকসানের কথা ভেবে রাজনীতি করতেন না। মহাসভা সাভারকরের 'Militarise the Hindus' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। সাভারকর ১৯৪১ সালে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনে বলেন, 'Hindu Mahasabhaits must...rouse Hindus especially in the provinces of Bengal and Assam as effectively as possible to enter the military forces of all arms without losing a single minute।' তিনি আরও বলেছিলেন,

'Militarization and industrialization of our Hindu nation ought to be the first two immediate objectives which we must pursue and secure to the best of our power, if we want to utilize the war situation in the world as effectively as possible to defend the Hindu interest।' সেই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাঁরা হিন্দুদের অধিক সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে যোগদানে আহ্বান জানিয়েছিল যাতে করে পরবর্তীকালে ওই প্রশিক্ষিত হিন্দুরা প্রয়োজনে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করতে পারে। এখানে স্মর্তব্য যে, জাপানে হিন্দু মহাসভার নেতা রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষিত এই ধরনের সেনারাই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

সুভাষ বসু বিভিন্ন সময়ে হিন্দু মহাসভা এবং তার নেতাদের সম্পর্কে কর্কশ মন্তব্য করলেও ড. শ্যামাপ্রসাদ বা বীর সাভারকর কখনও নেতাজী সুভাষ সম্পর্কে কোনো কটু মন্তব্য করেননি। বরং ড. শ্যামাপ্রসাদ পরবর্তীকালে নেতাজী সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ১৯৪৯ সালের ১৩ মার্চ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৬তম প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে ড. শ্যামাপ্রসাদ বলেন, 'chosen haunt of history where the dream of Bengal's hero of our century and India's Netaji Subhash Chandra has come true and the flag of India's independence flies over the Red Fort।' শুধু তাই নয়, নতুন প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে কানপুরে ১ জানুয়ারি ১৯৫৩-এ অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতি নেতাজীর অবদানের স্বীকৃতিতে দিল্লির লাল কেল্লাকে 'নেতাজী কেল্লা' নামে পরিবর্তিত করার প্রস্তাব করে বলেন, 'নেতাজীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল লালা কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের।' এছাড়াও ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩-তে সংসদে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের নেতা হিসেবে এক ভাষণে তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের নাম পালটে 'সুভাষ দ্বীপ' রাখার প্রস্তাব করেন। ড. দেবদত্তা চক্রবর্তী তাঁর Selected Political Documents of Dr. Syamaprasad Mookerjee গ্রন্থে বলেছেন, 'He (Shyamaprasad) had great admiration for Subhas Chandra Bose, Sarat Chandra Bose and J.M. Sengupta. During their internment in jails, he very often enquired in the Assembly about their health and the facilities they were given in prison।' এই সমস্ত ঘটনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, নেতাজী এবং ড. শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো বিদ্বেষ তো ছিলই না, পরন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতা হিসেবে নেতাজীর প্রতি ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

তবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন পর্বের ওই মতান্তরের পরেও হিন্দু মহাসভা ও তাঁর নেতৃবর্গের উপর সুভাষচন্দ্র বসু সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুভাষ বসু কংগ্রেসের কার্যকলাপে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ইতোমধ্যে হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে নেতাজীর দৃষ্টিভঙ্গিতেও তখন পরিবর্তন হয়েছে। ওই নির্বাচনের মাস তিনেক পরেই, জুন মাসের ২১ তারিখে, মতান্তরে ২২ জুন ১৯৪০, সুভাষচন্দ্র বসু মুম্বইয়ের দাদারে অবস্থিত সাভারকর সদনে গিয়ে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। সাভারকরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ সুভাষের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায়ও পরিবর্তন আনে। বয়োজ্যেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকর নেতাজী সুভাষকে পরামর্শ দেন তিনি (সুভাষ) যেন কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের মতো কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করে অনর্থক জেলবন্দি হয়ে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট না করেন। সাভারকরের সঙ্গে জাপান ইউনিটের হিন্দু মহাসভার সভাপতি রাসবিহারী বসুর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তিনি সুভাষকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে জাপান গিয়ে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পরামর্শ দেন ও রাসবিহারীর সাহায্যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য এক ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন করে ব্রিটিশ ভারতের উপর আক্রমণের পরামর্শ দেন।

সুভাষচন্দ্র বসু পরের বছর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ভারত ছেড়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে যান এবং সাভারকরের পরামর্শ অনুযায়ী জার্মানি হয়ে ১৯৪৩-এর জুন মাসে জাপানের টোকিয়োতে গিয়ে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে ৪ জুলাই ১৯৪৩-এ 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের' অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আজাদ হিন্দ ফৌজ) সভাপতিত্ব সানন্দে সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে সঁপে দেন। এ ব্যাপারে রাসবিহারী ও সাভারকরের মধ্যে আগেই পত্রালাপ হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, রাসবিহারী বসু হিন্দু মহাসভার জাপান ইউনিটের সভাপতি ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ১৯৪৪ সালের ২৫ জুন আজাদ হিন্দ রেডিয়ো থেকে এক বক্তব্যে সাভারকরের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'When due to misguided political whims and lack of vision, almost all the leaders of Congress party have been decrying all the soldiers in Indian Army as mercenaries, it is heartening to know that Veer Savarkar is fearlessly exhorting the youths of India to enlist in armed forces. These enlisted youths themselves provide us with trained men and soldiers for our Indian National Army।' অন্যদিকে সাভারকর ১৯৫২ সালে তাঁর অভিনব ভারত সংগঠন গুটিয়ে দেবার সময় নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, 'Long live deathless Subhas, Victory to the Goddess of freedom।'

উপরের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিন্দু মহাসভা এবং তার নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল সর্বদা, কথিত বিদ্বেষের কণামাত্র তাঁদের মধ্যে ছিল না। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বও সুভাষচন্দ্রকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তাঁকে আজাদ হিন্দ ফৌজের গুরুদায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকাকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা নেতাজী ও হিন্দু মহাসভার সম্পর্ককে যতই কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করুক ইতিহাসের কোষ্ঠীপাথরে তা টিকবে না, ইতিহাসের বিচারে নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ এবং সাভারকরই ভাস্বর হবেন। □

যোগতন্দ্রা থেকে উত্তরণের উচ্চস্তরীয় বিজ্ঞান

পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা আচার্য

১৮৯৬ সালে রয়েল মেডিক্যাল সোসাইটির সামনে চিকিৎসা জগতের প্রখ্যাত ডাঃ গ্লাস্টোন বলেছিলেন, 'রোগের সৃষ্টি, তার বৃদ্ধি বা আরোগ্য এবং শারীরিক কষ্টের সহনশীলতার উপর রোগীর মানসিক পরিস্থিতির এক বিশেষ ভূমিকা থাকে। রোগের উত্থান-পতন শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল হলেও মানসিক অবস্থা তার চেয়েও বেশি দায়বদ্ধ থাকে। যদি রুগি মানসিক ভাবে শক্তিশালী হয় তবে রোগের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। আক্রান্ত হলেও, অচিরেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। সেই জন্য ঔষধির উপর জোর দেওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তি বৃদ্ধির উপায়ের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত'।

মন ও স্বাস্থ্যের লেখক হেক ট্যুক শরীরের উপর মানসিক প্রভাবের বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যেমন আহারবিহার শরীরের উপর তার প্রভাব ফেলে ঠিক তেমনি অভাব আর আধিক্যও তার উপর সমান প্রতিক্রিয়া করে। সব থেকে বেশি প্রভাব পড়ে ব্যক্তিটির মানসিক পরিস্থিতির দ্বারা। দেখা গেছে, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশ, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির ক্ষেত্রে ৫৬ শতাংশ ও মাংসপেশীর ক্ষেত্রে ৮ শতাংশে এই প্রভাব তীব্রতর । বেশ কিছু রুগি আছেন যাদের শারীরিক পরীক্ষায় তেমন কোনো লক্ষণ পাওয়া না গেলেও কঠিন রোগ যেমন হৃদরোগ, ক্যান্সার, কোলাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হিস্টোরিয়া, অজীর্ণ বা অনিদ্রা ইত্যাদির সহজ শিকার হয়ে পড়েন। আশ্চর্য লাগে, যখন কোনো ওষুধেই তার সুরাহা হয় না অথচ ব্যক্তির চিন্তাস্রোতের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিনা ওষুধেই রোগের উপশম হয়ে যায়। শ্রী হেক তার প্রতিবেদনের উপসংহারে লিখেছেন, 'বিশ্বাস, আশা, শ্রদ্ধা, ইচ্ছাশক্তি এবং স্বসংকেত বা অটোসাজেশন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি রোগ নিরাময়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। রোগ নিবারণের জন্য সব থেকে সস্তা, সুনিশ্চিত আর হানিকারক নয় এমনই হচ্ছে এইসব প্রক্রিয়াগুলি।

যোগের প্রবক্তা পতঞ্জলি, গীতার প্রণেতা ব্যাসদেব ও যোগবশিষ্টের উপদেশক ঋষি বশিষ্ট সবাই সম্পূর্ণ রূপে একমত ছিলেন, যে মানসিক সংযমেই মানুষ সুখী হয় এবং প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

পতঞ্জলির যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই 'যোগ' বলা হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত ও ভ্রান্তিপূর্ণ উৎশৃঙ্খল মানসিক অবস্থাকেই মানবীয় শক্তি ও গুণের অবক্ষয় ও অপব্যয়ের কারণ বলে দায়ী করা হয়েছে। তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে দিগ্‌দর্শনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। গীতাতে বলা হয়েছে, মনই মানুষের মিত্র ও শত্রু। তাকে নিয়ন্ত্রিত করেই মানুষ তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করতে সক্ষম হয়। যোগবশিষ্ট বলে, যে মানুষ তার মনের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পেরেছে, তাকে ত্রৈলোক্য বিজয়ী বলাই যেতে পারে। এই সমস্ত প্রতিপাদ্য থেকে একথা মেনে নিতে হয় যে, মানসিক মহিমা শারীরিক সুস্থতার থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং এটাও বোঝা যায়, অনেক সমস্যার উদ্ভব ও সামাধান ওই দুইটির ভারসাম্যের উপরই নির্ভরশীল। এইজন্য যত্ন সহকারে মনকে অপসংস্কারের মায়াজাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়িতে বাঁধতে হয়। আত্ম নিয়ন্ত্রণ (ইকুয়ামিনিটি অব স্পিরিট) ও আত্ম-অনুশাসনের (সাইকোফিজিক্যাল ডিসিপ্লিন) অভ্যাসকেই যোগসাধন বলা হয়। এতে করে নাড়ীমণ্ডল ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রভুত্ব জন্মায়। ফলত, মানুষ নিজেই নিজের প্রভুতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, অব্যবস্থিত কল্পনা ও অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছায় বশীভূত মানুষ আত্ম-বিড়ম্বনায় ভোগে এবং নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করার মতো বিষম অবস্থার সৃষ্টি করে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যার আছে তিনিই নিরোগী

ও দীর্ঘায়ু হতে পারেন। যারা ইচ্ছা ও অভ্যাসের দাস, তারা কিন্তু নিজেদের নিরীক্ষণ করার সময়ই পান না। তারা না তো নিম্নগামী জীবনপ্রবাহকে রোধ করতে পারেন, না তাকে ঊর্ধ্বগামী করতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে, এই অক্ষমতাই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের দারিদ্র্য ও দুর্বলতা। একে দূর করতে না পারলে দুর্গতি থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকে না। এই জন্যই সমৃদ্ধিশালী ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য চাই সুব্যবস্থিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস। শারীরিক কাজকর্মের শুদ্ধতার জন্য সহজেই সাধন সামগ্রী পাওয়া যায় কিন্তু মানবীয় গুণের স্ফুরণের জন্য চাই আত্মনিগ্রহ। ঔদ্ধত্য ও পারুষ্যের সাহায্য অপহরণ বা অন্যায় উপায়ে ধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি করে অন্যকে সহজে বশে আনা যায়। পরন্তু স্নেহ বা সহযোগিতার ক্ষেত্রে মানবিক গুণগুলিই হয়ে ওঠে একান্ত ভাবে অপরিহার্য। এই গুণগুলির স্ফুরণ ও বৃদ্ধির জন্য মানুষকে মনের কোণে সঞ্চিত কুসংস্কারকে সবলে পরিষ্কার করে সুসংস্কার সৃজন করতে হয়। এই বিপরীতাত্মক দ্বৈতবোধের দ্বন্দ্বকেই বলে ধর্মযুদ্ধ বা সমর-সাধন। দৈবসত্তা এই ধর্মযুদ্ধের জন্যই অর্জুনকে প্ররোচিত এবং বাধ্য করেছিলেন যুদ্ধ করতে।

মনের অস্থিরতার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য সাধককে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির অভ্যাসের কঠিন অনুশীলন শেখানো হয়। এভাবেই বশীভূত মনের সাহায্যে উৎকৃষ্টতর সাধনার পথে অগ্রসর হবার শিক্ষা পাওয়া যায়। শারীরিক ও মানসিক গুণগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ সাধিত হলে সেই ব্যক্তির মধ্যে সহজেই প্রৌঢ়ের পরিপক্কতা অর্জিত হয়। তখনই তার মধ্যে মহত্বপূর্ণ কাজ করার ক্ষমতা এবং সম্ভাবনার আশা জাগ্রত হয়।

যে সব লোকের মধ্যে ছেলেমানুষী চঞ্চলতা ও লক্ষ্যহীনতা আছে তারা বাঁদরের মতো অস্থিরমতি ও নিরর্থক স্বভাবের হয়। তাদের দ্বারা কোনো ক্রমবদ্ধ, দিশাবদ্ধ বা মহত্ত্বপূর্ণ কার্যও সম্পন্ন হয় না। মনে রাখতে হবে, যোগ কোনো রহস্যবাদ বা পলায়নবাদী তত্ত্ব নয়। তাতে শারীরিক কষ্টের বিধানও

মানুষ সাধারণ কার্যের জন্য মস্তিষ্কের মাত্র ৭ শতাংশই ব্যবহার করে থাকে। বাকি ৯৩ শতাংশই অব্যবহৃত থেকে যায়। এটার কারণ শরীর বা মনোবিজ্ঞানীরা কেউই আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানতে পারেননি। আজও জানা যায়নি, কী কারণে এই অংশ সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং কীভাবে কোন প্রয়োজনে, একে কোন অবস্থায় কাজে লাগানো যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা এটাকেই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বলে অভিহিত করেন।

কোথাও লেখা নেই। কিন্তু দুঃসাহসী ও অতিবাদী কিছু লোককে যোগের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য অনেক দুর্বলমনের লোককে ঠকাতে দেখা গেছে। যোগের মধ্যে কোথাও কল্পনা-জগতের অবাস্তবতা নেই। এর মধ্যে কোনো জাদুবিদ্যার অলৌকিকত্বও লুকিয়ে থাকে না। দেবতাদের বশীভূত করে বা ভূতপ্রেতের সাহায্য নিয়ে নিজের বা অপরের মনোস্কামনা পূর্ণ করার বিদ্যাও যোগের মধ্যে দেখা যায় না। যোগ হচ্ছে এক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। যার বাস্তবিক আধার হচ্ছে অনুশাসনের অভ্যাস ও উচ্চতর কার্যের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার সফল প্রয়োগ। যিনি এটা সাফল্যের সঙ্গে করতে পারেন সেই মহাত্মাকে তখন সিদ্ধপুরুষ বলা হয়। মানুষের চৈতন্যের উচ্চস্তরে দৈবী বিভূতির অনুভূতি লাভ হয়। সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে তা অধিক মাত্রায় দেখা যায় এবং প্রয়োজন পড়লে তার যথাযথ প্রয়োগও যুক্তিসম্মত হয়। যদি অপপ্রয়োগ করা হয়, তবে সেই অমৃতই হয়ে ওঠে বিষ। অসাধারণ এই মানসিক শক্তির প্রকাশ সময় বিশেষে নানা প্রকার বিপত্তির কারণও হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়, সমস্ত ভৌতিক সুযোগসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও নানা প্রকার শোকসন্তাপ থেকে মুক্ত হতে পারছে না। পঞ্চভূত থেকে সৃষ্ট অন্য প্রাণীরাও এই সংসারে প্রকৃতির অনুশাসনের দ্বারা চালিত ও পালিত হয় কিন্তু তারা সুখী জীবনযাপন করে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায়, মানুষ জড় জগতের উপাদান থেকে প্রাপ্ত ভৌতিক শরীর ছাড়াও চেতনা ও মনকে পায়। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাই বলেন উচ্চস্তরীয় চেতনাযুক্ত হওয়ার কারণে মানুষের মন ও চিত্তের অনুশীলনের অভ্যাস করা উচিত। এই কারণেই বিভিন্ন প্রকার মানসিক অসন্তোষ ও সন্তাপ দূর করার জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এটা তখনই সম্ভব হয়, যখন নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রয়োজনে, যথাযথ রীতিনীতি মেনে সেই অসীম মানবীয় ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা হয়।

অনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস থেকে উৎপন্ন শারীরিক ব্যাধি বা মানসিক রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়, বিষাদমুক্ত জীবনে স্বচ্ছ ও নির্মল মনোভূমি তৈরি করা। সমৃদ্ধ ও সফল জীবনের জন্য তো এটা অত্যাবশ্যক। এই জন্য মানসিক ক্ষমতার উপযোগিতা বুঝতে পারে এমন প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত যোগাভ্যাসের অনুশীলনের জন্য ভাবা এবং বাস্তবায়িত করার জন্য কিছু করা।

মহান যাঁরাই হয়েছেন তাদের কোনো না কোনো প্রকারে এই অন্তঃচেতনার উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য যোগাভ্যাস করতে হয়েছে। অন্য যারা সেই দিকে অগ্রসর হতে চায় তাদের জন্যও সহজ এবং সুনিয়োজিত যোগাভ্যাসের ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। বলিষ্ঠ হওয়ার জন্য ব্যায়াম, বিদ্বান হওয়ার জন্য অধ্যয়ন, উপার্জন করার জন্য পরিশ্রম করা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনিই মনস্বী হওয়ার জন্য যোগসাধনার স্বরূপ বোঝা ও

তার সঠিক প্রয়োগ করার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। ১৯৬৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল বিজেতা জন এক্লসের সিদ্ধান্ত, জীবরসায়নে নির্মিত মনুষ্যদেহে আত্মা নামে এক রহস্যময়ী সত্ত্বার অস্তিত্ব আছে। ১৯৮১ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল বিজেতা বিখ্যাত স্নায়ুমনোবৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রজার স্পেরির কথায়, আত্মার অস্তিত্ব এক সুনিশ্চিত তথ্য। মস্তিষ্কের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে উৎপন্ন এই আত্মা, শুধু একহাজার কোটি স্নায়ুমণ্ডলীকেই নয় বরং সারা শরীরের উপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে। এর কার্যক্ষেত্র অসীম ও ব্যাপক। পদার্থবিদ্যায় ১৯৬৩ সালে ইউজিন ডিগমোর নোবেল পান। তিনি বলেছেন, আত্মা এক অচেতন সত্তা যা চেতন সত্তাকে নিয়ত নিয়ন্ত্রণ ও সূক্ষ্ম ভাবে সঞ্চালন করে চলেছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ব্রায়ান জোসেফসন লিখেছেন, মনুষ্য শরীরে জড় পদার্থ, রসায়ন এবং অব্যক্ত শক্তির সংযোজনে সৃষ্ট অতি মানবীয় চেতন এক সত্তা আছে, যা নিজে অনিয়ন্ত্রিত থেকেও সবাইকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। নোবেল বিজেতা স্নায়ুমনোচিকিৎসক জন এক্লিসের কথায়, আমরা ক্রমশই আত্মার অনুভব ও দর্শনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সেদিন আর দূরে নেই যে দিন, অবিজ্ঞান বা অদৃশ্য না থেকে আত্মাকে সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করা যাবে, যেভাবে অন্যান্য শক্তিগুলিকে আমরা অনুভব করি ঠিক তেমনি ভাবেই।

আত্মা শুধু জাগতিক রসায়ন, অসীম শক্তি না কি ব্রহ্মাণ্ডে সংলিপ্ত মহাচৈতন্যের এক অংশমাত্র, এ নিয়ে বিতর্কের আর শেষ নেই। তবে একথা মানতেই হয় যে, আত্মা হচ্ছে এক অসাধারণ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা। এই রহস্যময় অদৃশ্য শক্তিকে উঠানো, জাগানো, সংশোধন করা এবং সঠিক ভাবে তার প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জনকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তার বিশিষ্ঠতার পরিচয় বহন করেন। এই অসাধারণ ক্ষমতা অর্জনের অবিসংবাদিত পথ হচ্ছে যোগসাধনা অভ্যাস করা।

আমেরিকার হিল্টন হোটেল শৃঙ্খলাসমূহের মালিক কনরাড হিল্টন সেই সময়কার ধনকুবেরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তার এই অসামান্য সফলতার কারণ হিসেবে বলেছেন, 'অন্তঃকরণের ডাক'। যেটা তিনি শিখেছিলেন তারই ব্যবসায়িক বন্ধু লিডল হেসের কাছ থেকে। তিনি এই দুঃসাহসী কাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিপুল ধনরাশি ও অপরিমেয় যশ অর্জনেও সমর্থ হয়েছিলেন। লিডল হেস তার সাফল্যের জন্য পুরুষার্থের দাবি করতেন এবং তার কারণ হিসেবে অন্তঃকরণের সেই ডাককেই শ্রেয় দিতেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য পেয়েছেন এমন লোকদের বৈশিষ্ঠের মধ্যে কী কী উপাদান আছে তা জানা যায় যদি কোনো অতীন্দ্রিয়বাদী সেইসব সফল লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এরকম সফল মানুষের তালিকায় শিল্পপতিদের নাম সব থেকে আগে আসে। শিল্পকে মহত্ত্ব দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে রেখে অন্যান্যদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যান। এই অন্বেষণে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা যায়, যাঁদের 'অন্তঃকরণের ডাকে'র উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং বিষম পরিস্থিতিতেও তার উপরেই নির্ভর করেছিলেন, তাঁরাই সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছিলেন। কারুর মধ্যে এই ক্ষমতা উৎপন্ন হয়েছে জন্মগত ভাবে অথবা অন্য কারুর কাছ থেকে পেয়ে কিংবা যোগসাধনার দ্বারাই এই ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। কারুর কারুর মধ্যে আবার সহজেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার প্রকাশ হয়। এই অভিব্যক্তির প্রকাশ এটাই সিদ্ধ করে যে এই মানবীয় ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। দৈবাৎ যদি তার বহিঃপ্রকাশ কোনো কারণে কখনও কারুর মধ্যে দেখা যায় তবে, আশা করা যায় যে, তাকে অনুশীলনের দ্বারা জাগ্রত করাও সম্ভব হবে। কলাকৌশলের দ্বারা তাকে জাগানো এবং কাজে লাগানোও সম্ভব হতে পারে। সময় সময়ে এই রকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের সন্ধান প্রায়ই জানতে পারা যায়। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ক্ষেত্র মানুষের চৈতন্য জগতেরই এক অপরিহার্য অংশ। সাধারণত মানুষের শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষের চোখ নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্তই দেখতে পায়। বুদ্ধির দ্বারা যা অনুমান করা যায় তাকে প্রমাণ অথবা বিশেষ সাধনের সাহায্যে জানা যেতে পারে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে, দেশ ও কালের সীমাকে জাগতিক মানুষ জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু যে ক্ষমতা অর্জিত হলে দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে সব কিছু জানা যায়, তাকে অতীন্দ্রিয় বা তুরীয় শক্তি বলা হয়। মানুষের মস্তিষ্কের এমন এক অজানা অংশ আছে, যাকে আধুনিক শরীরবিজ্ঞানীর ডার্ক এরিয়া বলেন। মানুষ সাধারণ কার্যের জন্য মস্তিষ্কের মাত্র ৭ শতাংশই ব্যবহার করে থাকে। বাকি ৯৩ শতাংশই অব্যবহৃত থেকে যায়। এটার কারণ শরীর বা মনোবিজ্ঞানীরা কেউই আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানতে পারেননি। আজও জানা যায়নি, কী কারণে এই অংশ সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং কীভাবে কোন প্রয়োজনে, একে কোন অবস্থায় কাজে লাগানো যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা এটাকেই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বলে অভিহিত করেন। এই রহস্যময় ক্ষমতার ক্ষুদ্রতম অংশ কখনো সখনো সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। সিদ্ধপুরুষেরা তাকেই যোগসাধনার সাহায্যে প্রায়শই প্রকট করতে সক্ষম হন। □

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের প্রকৃত সত্য

ডাঃ আর এন দাস

বিশ্বের মানচিত্রের মধ্যে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো ইজরায়েলের আয়তন ও অবস্থান এবং ইহুদিদের অদম্য লড়াই দেখে বিষাদগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর মনে রণদুন্দুভি বেজে ওঠে । একদিন পৃথিবী জুড়েই ব্রিটিশদের আধিপত্য ও উপনিবেশ ছিল। এশিয়া মহাদেশের মধ্যপূর্ব ভাগে অবস্থিত চিরবিতর্কিত ও যুদ্ধক্লান্ত ঊষর মরুভূমির মধ্যে ব্রিটিশদেরই সৃষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের এই ভূভাগ। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মাঝে এক টুকরো নিষ্পেষিত মাংসপিণ্ডের মতো ইজরাইলকে গ্রাস করতে চায় উত্তর দিক থেকে তুর্কি, সিরিয়া, ইরাক ও ইরান এবং দক্ষিণে সৌদি আরব, লিবিয়া এবং মিশরের মতো সাতটি কট্টর বিশালাকায় ইসলামিক দেশ। ওই সবকটি দেশই প্রথমে ছিল ইহুদি, তারপরে খ্রিস্টানদের দখলে। আরও পরে মুসলমানরা নৃশংস হত্যা, লুট, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ করে বিধর্মীদের কাছ থেকে গায়ের জোরে ছিনিয়ে নেয় প্রায়। রোজই শোনা যায় ইজিপ্টের সংলগ্ন গাজা, সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত গোলান হাইট ও জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত 'ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে' ইজরাইল ও হামাসের সংঘর্ষের কথা। এটাই হলো 'হোলি ল্যান্ড' মানে পুণ্যভূমি। এটাকে নিয়েই ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী বিবাদ লেগে রয়েছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে ইজরায়েল, ক্যানন বা মোজেসের প্রতিশ্রুত পুণ্যভূমি ও আরবীয় মুসলমানদের কাছে লেভান্ট, আল সাম অথবা প্যালেস্টাইন নামে পরিচিত।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছর ধরে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন ছিল ইউরোপেরও বহু অংশ। সবাই খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ১৮৫০ সালের পর থেকেই ইউরোপের বহু অংশ স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধে জাগৃত হতে থাকে। জার্মান ও ইটালি ছিল তাদের পুরোভাগে। সেসময় থেকেই শুরু হয় ইহুদি নিধনের যজ্ঞ। সারা ইউরোপ থেকে ইহুদি বিতাড়নের হিড়িক পড়ে যায়। কারণ গোঁড়া ইহুদিরা খ্রিস্টের আবির্ভাবে অসন্তুষ্ট ছিল এবং যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় রোমানদের সাহায্য করেছিল। এমনকী শেক্সপিয়ারও 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এ ইহুদি শাইলকের চরিত্রটি কলঙ্কিত করে এঁকেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও মুসলিনি ও হিটলারের হিটলিস্টে উঠে এসেছিল ইহুদিরা। ১৮৯০ সালে থিওডোর হার্যেল নামে এক লেখক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক এবং দেশপ্রেমিক ইহুদির আবির্ভাব হয়, যাঁকে ইহুদি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক এবং জাতির জনকও বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম সমস্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদিদের নিজ দেশ অর্থাৎ ইজরাইলে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানান। তিন হাজার বছর ধরে ইহুদিরা বাইজান্টাইন, ব্যাবিলোনিয়ান, রোমান, অটোম্যান, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের দ্বারা নিজদেশ থেকেই বিতাড়িত হয়ে আসছিল। ইজরাইল ও জেরুজালেম ছিল পৌরাণিক শব্দ যা তালমুদ ও তোরাতেও উল্লেখিত আছে।

অন্যদিকে প্যালেস্টাইন নামটি ছিল অত্যন্ত আধুনিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আর্থার বেলফুর ইহুদি ব্যাঙ্কের মালিকদের কাছ থেকে প্রভূত অর্থসাহায্য নিয়েছিলেন এবং

ইহুদিদের ইজরাইলে তাদের নিজ বাসভূমি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটাকে বলে ১৯১৭ সালের বেলফুর চুক্তি। সে সময় ইরজাইলে ইহুদিরা মাত্র ৩ শতাংশ ছিল। সারা ইউরোপ থেকে তারা আসতে শুরু করলো। সেটাই বাড়তে বাড়তে ৩০ শতাংশ হয়ে গেছিল ৩০ বছরে। তারা ইজরাইলে জমি কিনতে লাগল ও আরবীয় মুসলমানদের যেনতেন প্রকারেণ তাড়াতে লাগল যেমনটি বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে করে চলেছে। ব্রিটিশরা সে সময় ইজরাইলকে ভেঙে আরবীয় মুসলমানদের জন্য প্যালেস্টাইন বানাবার ফন্দি আঁটছিল। ঠিক যেমনটি তারা করেছিল ভারত ভেঙে পাকিস্তানের সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সাইকেস-পিকো চুক্তির দ্বারা, রাশিয়া তুর্কিকে, ফ্রান্স সিরিয়াকে এবং ব্রিটেন আজকের ইজরাইল ও প্যালেস্টাইনকে কব্জা করে রেখেছিল। সৌদি আরব, ইরাক ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলি অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরোধী ছিল। তাই তারা ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করেছিল যুদ্ধের শেষে প্যালেস্টাইনের প্রসাসনকে আরবদের হাতে তুলে দিতে হবে বলে। চালাক ব্রিটিশরা কিন্তু 'বিভাজন ও শাসনের' নীতিতে নির্ভর করে খ্রিস্টান, ইহুদি এবং মুসলমানদের উপর অবাধে কুশাসন চালিয়ে যেতে লাগল সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে। ফলে প্যালেস্টাইনের মাটিতে মুসলমানরা ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করল। ব্রিটিশরা আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'ইহুদি মিলিশিয়ার' সাহায্যে মুসলমানদের ঠেকিয়ে রাখল বেশ কিছুদিন। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হিটলারের গ্যাস চেম্বারে মরতে দেখে ইহুদিদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম আরও তীব্র হলো। ইহুদিরা সারাবিশ্ব থেকে ইজরাইলে পালিয়ে আসতে চাইল। ব্রিটিশ প্রশাসন কিন্তু প্রতি বছর দশ হাজারের বেশি ইহুদিকে নিজের দেশে আসতে দেবে না বলে আইন জারি করে বসল যাতে করে ইহুদিদের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে না যায়। তখন সেই 'ইহুদি মিলিশিয়া'রা আর ব্রিটিশের কথা শুনতে চাইল না। তারা স্বনিয়ন্ত্রণ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই শুরু করল।

১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে, সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরামর্শে, ঠিক ভারত বিভাজনের মতোই মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল প্যালেস্টাইন আরব স্টেট ও সংখ্যাবহুল ইহুদিদের জন্য ইজরাইলের সৃষ্টি করা হলো। জেরুজালেমের উপর রাখা হলো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কারণ প্রথম থেকেই এখানে সমান সংখ্যক ৫০ শতাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও গোঁড়া ইহুদিদের বসবাস ছিল। এতে কিন্তু মুসলমানরা খুশি ছিল না। ১৪০০ বছর ধরে তারা অপরের জমি কব্জা করে এসেছে শুধুমাত্র গায়ের জোরে অন্যায় ভাবে। তাই ১৯৪৮ সালে তারা অর্থাৎ সিরিয়া, জর্ডন, ইজিপ্ট বা মিশর ও ইরাকের সম্মিলিত বিশাল সৈন্যবাহিনী অতর্কিত আক্রমণে ইজরাইলকে বিধ্বস্ত করে পৃথিবীর ম্যাপ থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় ছোট্ট 'ডেভিড ও দৈত্যাকার গলিয়াথে'র কাহিনি স্মরণ করে অসম সাহসী ইহুদি যোদ্ধারা এই অসম রণাঙ্গণে মুসলমানদের শুধু পরাস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং প্যালেস্টাইনের বহু এলাকা ইজরাইল ছিনিয়ে নিয়েছিল। ইজিপ্টের কাছে থাকে গাজা ও জর্ডনের কাছে থাকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক তখন ইজরাইলের দখলে।

জেরুজালেম-সহ প্যালেস্টাইনের প্রায় ৫০ শতাংশ ইহুদিরা ছিনিয়ে নেয়। এই লড়াইয়ে সাত লক্ষ আরব উদ্বাস্তু হয়ে পালাতে বাধ্য হয় পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে। এটাই ছিল ১৯৪৭-৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ও ইজরাইলের স্বাধিকার স্থাপনের প্রথম যুদ্ধ।

এবার আসি ইজরাইল-প্যালেস্টাইনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথায়। ১৯৬৭ সালে আবার সিরিয়া, ইজিপ্ট এবং জর্ডনের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ইজরাইলের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ইহুদিরা কিন্তু জর্ডনের কাছ থেকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, সিরিয়ার থেকে গোলান হাইট এবং ইজিপ্টের থেকে সাইনাই পেনিসুলা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের সীমানা এতটাই বাড়িয়ে নেয় যে ইজরাইলের আয়তন প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। তবে পরবর্তী সময়ে অবশ্য ইজরাইল শান্তির কথা চিন্তা করে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ছাড়া সমস্ত অধিকৃত অংশই ফিরিয়ে দেয়।

ইজরাইল ও প্যালেস্টাইনের তৃতীয় যুদ্ধ যা ১৯৭৩ সালের 'ইয়াম কাপু'র নামে বিখ্যাত উৎসবের দিনে শুরু হয়। পাকিস্তান যেমন দীপাবলীর দিনে ভারত আক্রমণ করে ঠিক তেমনি। প্রথম দিকে ইজরাইল অসতর্ক থাকার কারণে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে পিছনে সরে আসতে বাধ্য হয় কিন্তু ইহুদিদের পরাক্রমের কাছে আবারও সম্মিলিত বাহিনী হার স্বীকার করে। শেষমেষ আমেরিকার মধ্যস্থতায় 'কাম্প ডেভিড' নামক স্থানে সন্ধি হয় এবং ১৯৭৮ সালে ইজরাইল সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দিয়ে ইজিপ্টের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তার বিনিময়ে ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাত মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য তাকে বিশাল জনরোষের সম্মুখীন হয়ে গুপ্তঘাতকের হাতে মরতে হয়। ইজরাইল এই প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী এক বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ইজিপ্টের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি শান্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তারপর আরব দেশগুলি থেকে আর বড়ো কোনো আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি ইজরাইলকে। তবে প্যালেস্টাইনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল 'হামাস' নামে এক উগ্রপন্থী ও 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' নামে এক চরমপন্থী সংগঠনের। এই দুই ইসলামি সংগঠন গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে ও রাজনৈতিক ভাবে অবিরাম সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে থাকল। এই ইসলামিক জিহাদের ছায়াযুদ্ধে অসংখ্য নিরীহ ইজরাইলি নাগরিকের প্রাণ গেল। ১৯৬৪ সালে পি.এল.ও-র প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই প্লেন হাইজ্যাকের মাধ্যমে অসংখ্য আমেরিকা ও ইজরাইলি রাজনৈতিক নেতা, আধিকারিক, রাষ্ট্রদূত, অলিম্পিক খেলোয়াড়কে নির্মম ভাবে হত্যা করতে লাগল ওই কুখ্যাত সংগঠন। আরব দেশগুলির মধ্যে অনেকেই ইজরাইলের অস্তিত্বকে মেনে নিলেও প্যালেস্টাইনের সঙ্গে লড়াই এখনও জারি আছে।

পি.এল.ও-র বড়ো নেতা ছিলেন ইয়াসির আরাফাত। প্রথম ইন্তিফিডা মানে অভ্যুত্থান ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে হয়। ১০০টা ইজরাইলি মরেছে তে ১০০০টা প্যালেস্টাইনের নাগরিককেও মরতে হয়েছে। পি.এল.ও যদিও বা ইজরাইলকে স্বীকার করে পাশাপাশি শান্তিতে থাকতে চায়, কিন্তু হামাস মোটেও ইজরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না। আবার এই দুই সংগঠনের মধ্যেও বিবাদ লেগেই আছে কার্যপদ্ধতির বিভিন্নতা থেকে। পি.এল.ও রাজনৈতিক ভাবে ও হামাস প্রত্যক্ষ গেরিলা লড়াইয়ের মাধ্যমে

ইজরাইলের সঙ্গে চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে চায়।

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ১৯৯৩ নরওয়েতে 'ওসলো ঐক্যচুক্তি' সাক্ষরিত হলো পি.এল.ও-র প্রধান ইয়াসির আরাফাত ও ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইয়াটজিক রাবিনের মধ্যে। তারা নোবেল-শান্তি পুরস্কারও পেলেন যুগ্মভাবে। ইজরাইল 'গাজা স্ট্রিপ' ও 'ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক'কে 'ন্যাশনাল প্যালেস্টাইন অথরিটি'র হাতে তুলে দিল এবং পি.এল.ও প্যালেস্টাইনের লোকেদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে এবং আগামী ৫ বছর আর কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবে না— এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়েছিল। অন্যদিকে পি.এল.ও. ইজরাইলের অস্তিত্বকে মনে নিয়েছিল এবং স্বাধীন দেশের স্বীকৃতিও দিয়েছে। কিন্তু এতে হামাস প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে আরও ধ্বংসাত্মক হিংসার আশ্রয় নিয়ে ১০০০ জন নিরীহ ইজরাইলি নাগরিকের প্রাণ নিলে ইজরাইলের মোসাদের নেতৃত্বে ৩২০০ প্যালেস্টাইনের নাগরিক এবং সন্ত্রাসবাদীকে মার হলো। দ্বিতীয় ইন্তিফিদা ২০০০ সালে শুরু হয়ে ২০০৫ সালে শেষ হয়। কারণ ছিল মারাত্মক। ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইহুড বারাক ১০০০ সৈন্য নিয়ে ইহুদিদের পুণ্যভূমি টেম্পল মাউন্টে বা 'ডোম অব দ্য রকে'র তীর্থদর্শনে গেছিলেন। সেখানেই আছে মুসলমানদের মক্কা, মদিনার পর তৃতীয় প্রধান 'আল আক্সা' মসজিদ যেখান থেকে পয়গম্বর নাকি স্বর্গে গেছিলেন। আসলে জেরুজালেম শহরের মধ্যস্থলেই আছে 'ওয়েলিং ওয়াল' বা 'হাহাকার প্রাচীর' যেখানে প্রতি শুক্রবার ইহুদিরা বিলাপ করেন ও মুসলমানদের 'আল আক্সা' মসজিদ। ইহুদিরা গোটা শহরকে দখল করে রেখেছে। সেটাকেই তাদের রাজধানী বলে দাবি করে সমস্ত দেশের দূতাবাস সেখানে স্থানান্তরিত করতে চাইলেও আন্তর্জাতিক মান্যতা পাচ্ছে না। সবথেকে বড়ো সমস্যা হচ্ছে উদ্বাস্তু সমস্যা। '৪৮ ও '৬৮ সালের যুদ্ধে ৫ লক্ষের মতো প্যালেস্টাইনি লোক গাজা স্ট্রিপ, গোলান হাইট এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। আজ ৭০ বছরে তারা ৫০ লক্ষে পৌঁছে গেছে। হামাস চাইছে সেই উদ্বাস্তুদের ইজরাইলে থাকতে দিতে হবে। ছোট্ট দেশ ইজরাইলের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষ। তাদের পুনর্বাসনের জন্য শিবির করা হয়েছে কিন্তু 'হামাসের' জঙ্গিরা পি.এল.ও-র রাজনৈতিক পক্ষ 'ফাতাহা'কে অস্বীকার করে সেখানে অবাধ নির্বাচন হতে দিচ্ছে না বা ত্রাণসামগ্রীর সমবণ্টনে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। নিরীহ শিশু-মহিলা-বৃদ্ধ নাগরিকদের ঢালের মতো ব্যবহার করে ইজরাইলি সৈন্যের সঙ্গে রকেট, মিসাইল এবং সীমান্তে সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করে, জেনিভা চুক্তি ভঙ্গ করে, ইজরাইলি নাগরিকদের হত্যা করছে যেমন পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতের সীমান্তে করছে। পার্শ্ববর্তী ইরান, সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি দেশগুলি হামাসের মদতকারী মিত্র। মনে করুন কীভাবে 'গাজওয়া হিন্দ' করার জন্য রোহিঙ্গা মুসলমানদের জম্মুতে, রোশনী ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে, কাশ্মীর সরকার হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে আরও একটা পাকিস্তানের সৃষ্টি করতে চাইছিল। সব জায়গায় একই পদ্ধতি। সংখ্যা বাড়ানো, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং অমুসলমান কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে ধর্মান্তরকরণ, পলায়ন অথবা মরণ। সংক্ষেপে এই হচ্ছে ইজরাইল-প্যালেস্টাইনের সংঘাতের সত্য। □

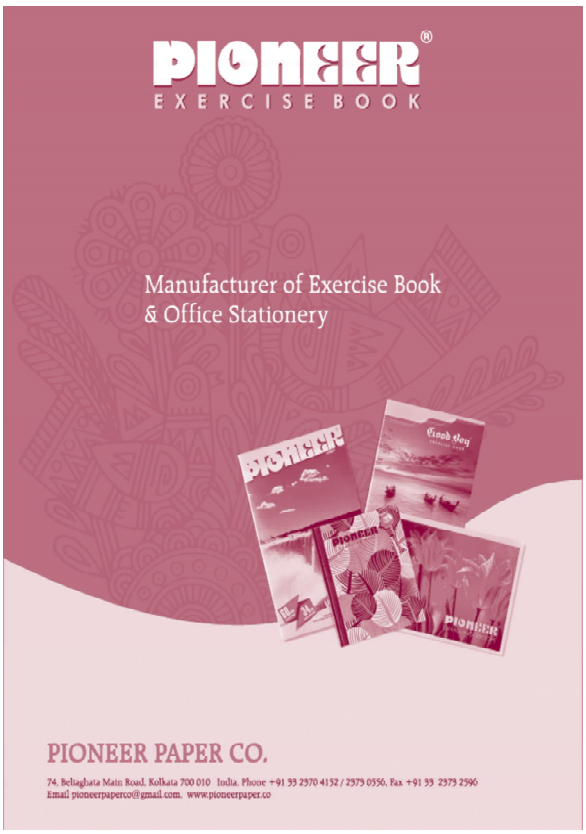

কলিযুগে অস্মিতা রক্ষার একমাত্র উপায় সঙ্ঘশক্তি

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কলির অবতার পুরুষ চৈতন্য মহাপ্রভু আজ থেকে প্রায় ৫৩০ বছর আগে বলে গেছেন 'সঙ্ঘেশক্তি কলৌযুগে'। শুধু বলেননি, মুসলমান শাসনাধীন তৎকালীন বঙ্গদেশে তা প্রমাণ করে গেছেন। মুসলমানের অত্যাচারে দিকে দিকে যখন হিন্দুরা আক্রান্ত, মানুষ পরিত্রাণের পথ খুঁজছে তখন তিনি সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে নাম সংকীর্তন করতে পথে নেমেছেন। প্রতিরোধ এসেছে। কিন্তু সে বাধা ধোপে টেকেনি ঐক্যবদ্ধ মানুষের সামনে। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ হিন্দুর ক্লীবতা দেখে বলতেন, 'হিন্দুর বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য সব আছে, নাই শুধু ঐক্য।' স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুত্বের আধারে জগতের মানুষের নিকট জীবনবোধের এক উচ্চতর ও উন্নততর স্তরে অবস্থানের কথা বলে গেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সামাজিক ঐক্যচেতনার অভাবে ভারতবর্ষ বার বার বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হয়েছে। রাজা আসে যায়, রাজবংশের পরিবর্তনের সঙ্গে রাজ আনুগত্য পাল্টানো স্বাভাবিক । কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণে যা পালটায় না তা হলো শাশ্বত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা।

যুগ যুগ ধরে ভারতভূমিতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা প্রবহমান আছে বলেই যখন পৃথিবীর আর সব পুরাতন সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভারতীয় সভ্যতা তাঁর প্রাচীন আঙ্গিক ও অন্তর্নিহিত সত্ত্ব ও সত্যকে বুকে ধরে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সামাজিক সমরসতা ও সংগঠনের অভাবে বার বার দেশ আক্রান্ত হয়েছে। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবি দস্যু বিন কাশিম সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করে রাজা দাহিরকে পরাজিত ও হত্যা করে। বিন কাশিম অসংখ্য হিন্দু হত্যা, নারী নির্যাতন ও হিন্দু বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস করে। কিন্তু শুধু অত্যাচার দিয়ে ঐক্যবদ্ধ মানুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে পালটে এক সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নতুন খাতে প্রবাহিত করা যায় না। ইতিহাসে এর প্রচুর উদাহরণ খুঁজলে পাওয়া যাবে। আফগানিস্তান ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রথমে ইংরেজ পরে রাশিয়ানদের দ্বারা পরাভূত হয়েছে, রাজত্ব পালটেছে। কিন্তু সামাজিক সমরসতার ঐক্য সূত্র যা ধর্ম ও সংস্কৃতি ছাড়া কিছু নয়, বিদেশি প্রভু ও তার ভাড়াটে সেনা তা ছিন্ন করতে পারেনি। যার জন্য পরাভূত আফগানরা বার বার জেগে উঠেছে। বশনিয়া-হার্জেগোভিনার নরহত্যার পরও সেখানকার মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক সত্তা বজায় রাখতে পেরেছে। একটি রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে নানান অনৈক্যের বিষয় থাকতে পারে। তার ভূগোল, ভাষা বা সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা তাকে অন্য রাষ্ট্র

থেকে আলাদা করে। এই ঐক্য সূত্রগুলি দুর্বল হলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মহান নামাবলী রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা পারে না। গণতান্ত্রিক যুগশ্লাভিয়া আজ ইতিহাস। প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া তুর্কমেনিস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান নামক ভূখণ্ডগুলিকে ধরে রাখতে পারেনি। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে দুই মহান ও বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে মর্যাদা দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এরা শুধু গণতান্ত্রিক উদারতা ও সমানাধিকার দিয়ে তাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারবে না। মুক্ত সংবহনের সুবিধা নিয়ে ক্যান্সার সেলগুলো যখন ক্রমে সারা দেহকে আক্রমণ করবে তখন শুধু শব পড়ে থাকবে। এর জন্য প্রাথমিক অবস্থাতেই চিকিৎসা প্রয়োজন। অর্থাৎ ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলোকে রে সহযোগে ধ্বংস করা ও একই সঙ্গে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে (পড়ুন সাংস্কৃতিক ঐক্য) সেগুলোকে চিরতরে দুর্বল ও অপাঙ্‌ক্তেয় করে ফেলা দরকার।

ভাষা, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসে বহুধা বিভক্ত হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা জটিল কাজ হলেও অসম্ভব নয়। হিন্দুদের কেন ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন তার নানান কারণ রয়েছে। যাকে রক্ষা করা হয় তাই রক্ষিত হয়। রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন সংগঠন শক্তি। শক্তির কাজ ত্রিবিধ--- ধ্বংস, পরিবর্তন ও সৃষ্টি। সংগঠিত হিন্দু শক্তিই পারে সংস্কার, নিরন্তর সেবাকাজ ও সমবেত আঞ্চলিক সম্মিলনের মাধ্যমে হিন্দুকে এক সশক্ত ও পরাক্রমী জাতিতে পরিণত করতে। হিন্দু সংগঠনের প্রযোজনীয়তা, প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা নিমিত্ত। হিন্দুত্ব পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাবধারা বা জীবনশৈলী হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই যুগের পরতে পরতে এতে অস্পৃশ্যতা, উচ্চ-নীচ, জাতিভেদ প্রথার মতো রোগগুলি বাসা বেঁধেছে। এসকল রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ সমন্বয় ও সমরসতা।

পঁচানব্বই বছর যাবৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হিন্দুকে জাতপাতের, ছোঁয়া-ছুতের ঊর্ধ্বে এক সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে। সামাজিক ঐক্যের অভাবে ১৯৪৭-এর পূর্ববঙ্গে ৩০ শতাংশ হিন্দু আজ ৯ শতাংশে ঠেকেছে। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের প্রায় ৯০ শতাংশ জমিদার ও বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন হিন্দু। তারা হিন্দুকে সংগঠিত করার জন্য দু-পয়সা খরচ করেননি। ফলত মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে তস্করের মতো। তারা ভারতে পালিয়ে বেঁচেছেন, অনন্যোপায় অবশিষ্ট দরিদ্র হিন্দুদের ওখানে ফেলে। হিন্দু সংগঠিত থাকলে ৩০ শতাংশ কমে ৯ শতাংশ হতো না। বর্তমান ভারতের মধ্যেও এমন অনেক এলাকা অছে যেখানে হিন্দুরা পলায়নরত। হিন্দুরা বিধর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আগ্রাসনের মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছে। কাশ্মীর, অসম, কেরলের মতো পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদে এরকম ঘটনা ঘটছে।

এককালের হিন্দু প্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রামের হিন্দু ক্রমশ মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিরাপত্তাহীনতার কবলে পড়ছে। পার্শ্বস্থ হিন্দু গ্রামগুলোর হিন্দুদেরকে তাদের অসহায়তা স্পর্শ করে না। কারণ তাদের তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। মুসলমান জনগোষ্ঠী ঘেটো করে বাস করে থাকে। ক্রমশ তারা এলাকা বিস্তার করে চলে নানান কৌশলে। হিন্দু এলাকায় জমি ক্রয় করে মসজিদ বানিয়ে, নীরিহ ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের নাকের ডগায় গোরু জবাই করে, দিনে পাঁচবার মাইকি অত্যাচার করে ও সংখ্যা বাড়িয়ে ছিঁচকে চুরি, গালমন্দ, হিন্দু মা-বোনেদের অশ্লীল ভাষা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে নতুন এলাকাকে হিন্দুমুক্ত করার প্রক্রিয়া চালু রাখে। পুরুলিয়ার মতো প্রত্যন্ত জেলাতে মুসলমান আবাদি ১০ শতাংশ তথাপি এই প্রক্রিয়া চালু আছে। মুসলমান ঘেটোর চারিদিকের উর্বর ধানি জমি খিল (চাষ না হওয়া) পড়ে থাকতে দেখা যায়, কারণ জমির মালিক হিন্দু তারা চাষ করেও মুসলমান দৌরাত্মের কারণে ফসল ঘরে তুলতে পারে না। প্রথম প্রথম মুসলমান রক্ষী নিয়োগের মাধ্যমে চেষ্টা করেন। পরে সেই প্রচেষ্টাও বিফলে যায়। তবুও কৃষিকাজ নির্ভর ধর্মপ্রাণ হিন্দু চাষবাসের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে কৃষিক্ষেত্রে মৃত গোরুর মাথার খুলি হাড় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

মুসলমান ঘেটোর চারিপার্শ্বস্ত হিন্দু জনপদের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধ করতে পারলে এই জিনিস ঘটে না। চাষবাসও চলতে পারে, আর জলের দামে জমি বিক্রি করে সরে যেতে হয় না। বর্তমানে চারটি 'L'-এর ক্রিয়া হিন্দু সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে চলেছে। এইসব ক্ষেত্রে জেহাদ চলছে অত্যন্ত কৌশলে। লাভ, ল্যান্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লঙ্গর জেহাদ দিয়ে হিন্দুর আত্মবিশ্বাসে আঘাত ও সাংস্কৃতিকে ধীর অথচ সফলভাবে পাল্টে ফেলার প্রয়াস জারি আছে। ল্যান্ড জেহাদের কথা বললাম। কেরলে লাভ জেহাদের নগ্নরূপ অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে। মুসলমান বহুল এলাকাগুলিতে হিন্দু মা-বোনদের নিরাপত্তার অভাব প্রকট হচ্ছে। প্রলোভন ও ক্ষেত্রবিশেষে বল প্রয়োগের মাধ্যমে হিন্দু যুবতীদের বিয়ে করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্র নির্মাণ ও হিন্দুদের ভীতসন্ত্রস্ত করা হচ্ছে। বাংলা ও হিন্দি ভাষাতে আরবি ও উর্দু ভাষার আগ্রাসন সমানে চলেছে। বাংলায় রাজ বদান্যতায় হয়তো আর কিছুদিন পরে 'প্রার্থনা' নামক বাংলা শব্দের ব্যবহার থাকবে না, তার জায়গা নেবে 'দোয়া'। হিন্দি তো নির্ঘাত উর্দু হওয়ার পথে। সর্বশেষ অর্থাৎ লঙ্গর ,জেহাদ ,আরবি খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করার চেষ্টা চলছে। মোগলাই, তন্দুরি এরপর বর্তমানে বিরিয়ানিকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রত্যন্ত এলাকাতেও বিরিয়ানি রেঁস্তোরা খোলা হচ্ছে। হিন্দি সিনেমাতে বিরিয়ানি প্রেম দেখানো হচ্ছে যেন এই খাবার না খেলে মানব জীবন ব্যর্থ। ফলত অনুকরণপ্রিয় হিন্দু অস্মিতারহিত যুবশ্রেণী ও আত্মঘাতী মেকি প্রগতিশীল, শিক্ষিত মধ্যবৃত্তরা ওইসব রেঁস্তোরাতে বিরিয়ানি খেয়ে আহ্লাদিত। একবারও ভাবেন না ৬৫০ টাকা কেজি দরের খাঁসি মাংসের সঙ্গে সস্তার কিছু মাংস মেশানো না থাকলে এ কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা

করার জন্য ও শাশ্বত হিন্দু সাংস্কৃতিক আধারে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। পাহাড় পর্বতকে দেবতাদের আবাস, নদ-নদীকে মাতৃকা, শাল, অশ্বত্থ, নিম গাছকে পূজ্যজ্ঞান করা ভারতীয় সনাতন হিন্দু পরম্পরা। হাজার হাজার বছর পূর্বে হিন্দু মুনি-ঋষিগণ শান্তি মন্ত্রে মানুষ, প্রাণীকুল-সহ উদ্ভিদ জগতের মঙ্গলের জন্য আকুতি করেছেন--- 'পৃথিবী শান্তিঃ, অন্তরিক্ষ শান্তিঃ, বনস্পতয় শান্তিঃ শান্তির্বিশ্বদেবঃ।' উদার হিন্দুত্ববাদী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্বময় প্রচারের প্রয়োজন, না হলে প্রকৃতির রোষ থেকে মানব সভ্যতাকে বাঁচানো কঠিন। এটি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ, সশক্ত, স্বাভিমানী ভারতকে প্রয়োজন। দুর্বলের হিতোপদেশ সবলের নিকট মূল্যহীন বকবক মাত্র। তাই মূল্যবান মানবতাবাদী দর্শন প্রচার করতেও প্রয়োজন জাগরিত ও সংগঠিত হিন্দু শক্তির। হিন্দু মনোভাবাপন্ন সরকার দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বর্তমানে নানান আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রয়োজনীয়তা বিশ্বসমুদায় উপলব্ধি করছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-সহ তাবড় রাষ্ট্র পরিবেশ পর্যাবরণ রক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য প্রভৃতির প্রয়োজনে ভারতের মুখাপেক্ষী। কিছুদিন পূর্বেও প্রধানমন্ত্রী অপরাপর বিশ্বনেতাদের ছায়ায় ঢাকা পড়তেন। আজ দিন পাল্টেছে। আত্মশক্তিতে ভরপুর, দেশীয় মূল্যবোধের আধারে সুসংস্কারিত ও শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী আজ সকলের মধ্যমণি হয়ে বিশ্বের. দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। এটা সম্ভব হয়েছে জাগরিত হিন্দু শক্তির রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পাওয়াতে। হিন্দু সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা হিন্দুর শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্যও বটে। শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ যে কোনো সংগঠনের সদস্যদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। শরীর ও বুদ্ধির সুসংহত বিকাশই পারে বহিশত্রুর হাত থেকে দেহ মন্দিরকে রক্ষা করতে। ইহুদিরা যখন পৃথিবী জুড়ে অত্যাচারিত হচ্ছে, তাঁদের নিজস্ব কোনো রাষ্ট্র নেই, যেখানে নিরাপদে বিশ্বের সমস্ত ইহুদি বসবাস করতে পারেন, এমতাবস্থায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.২ শতাংশ ইহুদি শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তারা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে চতুঃপার্শ্বস্থ আরব হানাদারদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ ও মেধা মানব ইতিহাসে এক মাইলস্টোন। ০.২ শতাংশ ইহুদি বিশ্বের ৬০ শতাংশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জনক। নোবেল পুরস্কার প্রাপক বিজ্ঞানীদের সিংহভাগই ইহুদি।

অতএব অস্তিত্ব রক্ষা, সংবর্ধন ও অগ্রগমনের জন্য একমাত্র পন্থা সংগঠন করা। এটা বুঝলেই হিন্দুর ইহলোক ও পারলৌকিক মঙ্গল। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বিনীত প্রার্থনা, আপনি দয়া করে আপনার কুরুচিকর ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত হোন। কেননা এ ভাষা আপনার মতো একজন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতার মুখে শোভা পায় না। এ ভাষা হাটে-বাজারের লোকের ভাষা, এভাষা রকের ভাষা, এ ভাষা চোর, গুন্ডা, লম্পটদের ভাষা।

মুখ্যমন্ত্রী আদপে বাঙ্গালি কি না সন্দেহ থেকে যায়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

১০.১২.২০২০ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রসাদ নাড্ডা ডায়মণ্ডহারবারে সভা করতে যাওয়ার পথে শিরাকোলে আক্রান্ত হলন। তাঁর কনভয়ের উপর হামলা করে তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারা। সেই হামলার ছবি দূরদর্শনের দৌলতে গোটা বিশ্বের মানুষ দেখেছেন। হামলাকারীরা নাড্ডা-সহ বিজেপি নেতাদের গাড়িগুলি ভাঙচুর করেছে। কোনোরকমে সভায় পৌঁছে নাড্ডা বলেছেন— 'মা দুর্গার কৃপায় এখানে আসতে পেরেছি। বুলেটপ্রুফ গাড়ি বলে কোনোরকমে রক্ষা পেয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নাড্ডা বলেছেন, 'দয়া করে আগুন নিয়ে খেলবেন না। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করা সত্ত্বেও রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। মুখ্যসচিব, ডিজিকে বলেছি এমন ঘটনা ঠিক নয়। মানবাধিকার দিবসে কী হলো রাজ্যে। ডায়মন্ডহারবারের ঘটনা সংবিধানের পক্ষে লজ্জাজনক।'

রাজ্যপাল নাড্ডার কনভয়ে হামলা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন আগেই। এরপর এই ইস্যুতে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, 'আগুন নিয়ে খেলবেন না। বৃহস্পতিবারের ঘটনা গণতন্ত্রের লজ্জা। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত। ক্ষমা চাইলে ওঁনারই সম্মান বাড়বে।'

মুকুল রায় বলেছেন, 'নাড্ডাজীর সঙ্গে যা হলো, তারপর এটাই বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। তুমুল অরাজকতা চলছে। আইনের শাসন অস্তমিত।'

এই হামলার পর মুখ্যমন্ত্রী ওইদিন ধর্মতলায় কৃষক সমাবেশের মঞ্চ থেকে ওই ঘটনার জন্য উলটে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— 'বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মিনিস্টার চলে আসছেন। কোনোদিন চাড্ডা, নাড্ডা, গাড্ডা, ফাড্ডা, ভাড্ডা সব চলে আসছে এক এক করে। এরা কেউ মানুষের জন্য কাজ করে না। আর যেদিন তারা অনুষ্ঠান করবে, তাতে যদি লোক না আসে নিজেরাই নাটক করার জন্য সব সাজিয়ে রাখবে। যাতে নাটক করে জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেখানো যায়। দেখো আমায় মেরছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নাড্ডার প্রতি মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিমান বসু

ক্ষুদ্র ও কায়েমি স্বার্থে চিৎকার করে প্রকাশ্য জনসভায় গলা ফাটিয়ে মঞ্চে নাচানাচি করে আজ যাঁকে কুকথা বলছেন, ভবিষ্যতে এই অনিশ্চিত রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে কে জানে ওই গালমন্দ করা বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই হয়তো অচ্ছ্যুৎ হাতগুলিকে শক্ত করে ধরতে হবে।

বলেছেন— 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাউকে আক্রমণ করতে গিয়ে উত্তেজিতভাবে ছন্দ মিলিয়ে চাড্ডা, নাড্ডা, ফাড্ডা, গাড্ডা বলেছেন। চাড্ডা মানে পঞ্জাবি। পঞ্জাবি ছাড়া চাড্ডা হয় না। কিন্তু ছন্দ মিলিয়ে কথা বলতে গিয়ে যে গাল দেওয়া হলো, তার পরিণাম খুব খারাপ হবে। এটা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। আসলে আমাদের রাজ্যে যেমন মুখ্যমন্ত্রী তেমনই বক্তব্য হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। বিমানবাবু আরও বলেছেন— 'শুনেছি তিনি ভাষাবিদ। কিন্তু তাঁর (মুখ্যমন্ত্রী) মুখে আজ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট উচ্চারণ করতে শুনলাম না। সব সময় শুনতে পাই 'গরমেন্ট'। তাহলে গভর্নেন্স কোথা থেকে আসবে। তিনি ইংরেজি ভাষায় কীভাবে কথা বলতে হয়, জানেন না। হরিনাথ দে আমাদের বিখ্যাত ভাষাবিদ, এরপর আর একজন ভাষাবিদের নাম শুনলাম, তিনি মুখ্যমন্ত্রী।'

বিমান বসুর কথার সূত্র ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বাণী এবং ভাষা সম্পর্কে বলা যায়— তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা তাঁর আগের আটজন মুখ্যমন্ত্রী কোনোদিন উচ্চারণ করতে পারেননি বা করেননি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বিজেপি দল এবং সেই দলের বিভিন্ন নেতাদের প্রতি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ওই দলের সর্বভারতীয় সভাপতিকে যে ভাষায় গালাগালি করলেন বা আগে করেছেন তা কানে গেলে মনে হয় অনেকেরই সেই ভাষার দুর্গন্ধে পেট থেকে অন্নপ্রাসনের ভাত বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে। এ যেন পচা ড্রেনের দুর্গন্ধ।

ইতিপূর্বে নির্বাচনী প্রচারে তো বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ভাষা প্রয়োগে তিনি পশ্চিমবঙ্গকে দেশের মানুষের সামনে লজ্জাকর অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। না হলে, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হয়ে মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে দেশের সাংবিধানিক প্রধান প্রধানমন্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে পারেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও গালাগালি থেকে বাদ যাননি।

এক দীর্ঘ ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী। এঁরা প্রত্যেকেই রাজ্য ও দেশবাসীর কাছে প্রণম্য। সাধারণ মানুষের কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহ। ভবিষ্যতে মানুষ কাকে নির্বাচিত করবেন, সেটা মানুষের চিন্তা-চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন ও ব্যর্থতার নিরিখেই ঘটে রাজনৈতিক পালাবদল। তা বলে একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী আর একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বা সেই দলের নির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতিকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করবেন, একে গণতন্ত্রপ্রেমী সাধারণ শিক্ষিত সমাজ মান্যতা দেয় না। এমনকী শাসকদলেরও অনেক সমাজ সচেতন মানুষ শাসক সুপ্রিমোর কদর্য শব্দবন্ধকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও দুর্ভাগ্যজনক বলেই মনে করেন। প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো, দাঙ্গাবাজ, হরিদাস, তুই, তুমি, গণতন্ত্রের থাপ্পড়, কান ধরে উঠবোস, কাঁকরের লাড্ডু খাওয়ানোর মতো কথা, নাড্ডাজীকে নাড্ডা, ফাড্ডা, গাড্ডা, ভাড্ডার মতো ভাষা প্রয়োগ কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি উচ্চারণ করতে পারেন?

রাজনীতির গতিপথ যেমন বাঁকা ও জটিল, তেমনি প্রতিটি মুহূর্তই এর অনিশ্চয়তায় ভরা। ক্ষুদ্র ও কায়েমি স্বার্থে চিৎকার করে প্রকাশ্য জনসভায় গলা ফাটিয়ে মঞ্চে নাচানাচি করে আজ যাঁকে কুকথা বলছেন, ভবিষ্যতে এই অনিশ্চিত রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে কে জানে ওই গালমন্দ করা বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই হয়তো অচ্ছ্যুৎ হাতগুলিকে শক্ত করে ধরতে হবে। কারণ এরই নাম রাজনীতি। আর যিনি আগাম পরিবর্তনের আঁচ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজনীতিবিদ।

এক সময়ে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মেধা, বুদ্ধি এবং বক্তৃতায় গুণী সমাজ দেশকে যে পথ দেখিয়েছেন, সাম্প্রতিক ইতিহাস ও ঘটনাবলী কি তা প্রমাণ করতে পারছে? আর অদ্ভুতভাবে কী নিদারুণ অসহায় হয়ে পশ্চিমবঙ্গের তামাম বুদ্ধিজীবীকুল নীরব। নেই কোনো প্রতিবাদ, নেই কোনো জোরালো আওয়াজ। অথচ এঁরাই এক সময় উত্তরপ্রদেশের এক মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যার কারণে পদক ফেরানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন দেশে অসহিষ্ণুতা বেড়ে গেছে বলে। অথচ ভাবুন কী দুর্ভাগ্য আমাদের, শাসকের ভয়ে বা কিছু প্রাপ্তিযোগের আশায় পরম ভক্তিতে এই পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীকুল রাস্তায় নামেন না, এমনকী দেশি ও বিদেশি সন্ত্রাসবাদীতে রাজ্য ভরে গেলেও নিজেদের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে চুপ থাকেন। গণতন্ত্র লুট করতে শাসক যেখানে রাজ্যের সর্বত্র নিয়মিত মানুষ খুন করছে সেখানেও কী অদ্ভুত নিয়মে তাঁরা নীরব। সবাই নিজেকে সুরক্ষিত করতে, পিঠ বাঁচাতে কী ভীষণ স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছেন।

এই বঙ্গপ্রদেশের আদি কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ইতিহাস সারা বিশ্বে একসময় সমাদৃত ছিল। একটা সময় ছিল যখন বলা হতো, 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow and the world thinks day after tomorrow।' —অর্থাৎ 'পশ্চিমবঙ্গ আজ যা ভাবে, গোটা ভারত তা ভাববে আগামীকাল এবং পৃথিবী ভাববে তারও একদিন পর।' বাঙ্গালির মনন, চিন্তন, ভাবনা, কর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির যে মাধুর্য, যে মহিমা তা সারা ভারতের কাছে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সভায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে 'সোনার বাংলা' উপহার দেওয়ার স্বপ্ন দেখালেও আদতে পিছন থেকে বাঙ্গালি সংস্কৃতিকেই ছুরি মারছেন প্রতি মুহূর্তে। ধ্বংস করছেন বঙ্গপ্রদেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে।

তাই মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বিনীত প্রার্থনা, আপনি দয়া করে আপনার কুরুচিকর ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত হোন। কেননা এ ভাষা আপনার মতো একজন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতার মুখে শোভা পায় না। এ ভাষা হাটে-বাজারের লোকের ভাষা, এভাষা রকের ভাষা, এ ভাষা চোর, গুন্ডা, লম্পটদের ভাষা। এ ভাষা প্রয়োগ আপনার পক্ষে মানানসই নয়। আর মানুষের মুখের ভাষাই তাকে মর্যাদা দান করে। □

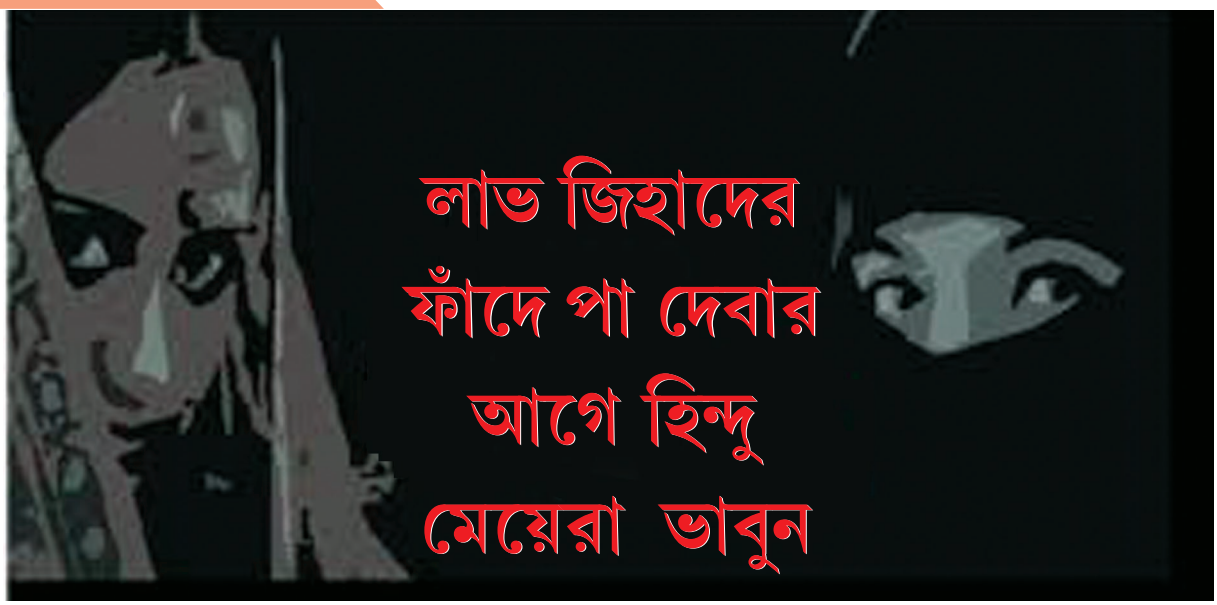

লাভ জিহাদের ফাঁদে পা দেবার আগে হিন্দু মেয়েরা ভাবুন

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

সম্প্রতি বাংলাদেশের কণ্ঠশিল্পী হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থানার বরিশাল গ্রামের পূর্ণেন্দু শেখর চক্রবর্তীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রিয়াঙ্কা তার হলফনামায় উল্লেখ করেন মুসলমান বন্ধু-বান্ধবদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম সম্পর্কে জানেন ও বোঝেন। এই সময় পবিত্র কুরান হাদিস ও মহম্মদের জীবনী পড়ে তিনি ইসলামের সৌন্দর্য ও আচার-আচরণে মুগ্ধ হন এবং সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ৩ আগস্ট ইসলাম গ্রহণ করেন। নাম হয়েছে আয়েশা সিদ্দিকা। ইসলাম গ্রহণের পর ৮ আগস্ট হবিগঞ্জ জেলার কামারগাঁও গ্রামের আব্দুল মুক্তারের ছেলে সাবির আহম্মাদ রনিকে বিবাহ করেন প্রিয়াঙ্কা। প্রথম কথা, এই বিয়ের ফলে ব্রাহ্মণ তরুণীর সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক শেষ হলো। কারণ তার পিতা-মাতা কাফের।

'তোমরা নিজেদের পিতৃদেবকে ও ভ্রাতাদেরও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ইমামের চেয়ে কাফেরকে প্রিয় মনে করে, আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুত ওই সব লোকেরাই বড়ো জালেম। সবচেয়ে বড়ো কথা তার পিতা-মাতার মৃত্যু হলেও সে নিজে কাফের পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দোয়া করতে পারবে না'। (৯/২৩)

'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর (উভয়েই সমান) যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লা তাদের ক্ষমা করবেন না, এর কারণ এই যে তারা আল্লা ও রসুলের সঙ্গে কুফুরি করেছে। আর আল্লা এরূপ অবাধ্য লোকদের পথ প্রদর্শন করেন না'। (৯/২৩)

'আল্লাপাক বলছেন নবি ও মুমিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তারা আত্মীয় স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী'। (৯/২৩)

কুরানের এই আয়াতগুলোকে কখনোই প্রিয়াঙ্কাকে বলা হয়নি।

মুসলমান হয়ে কুরান অনুসারে মেয়েটি স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন সবাই সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব হিসেবে পরিগণিত হবে।

'নিশ্চয় যারা আমার নির্দেশসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের আমি অগ্নিকুণ্ডে দাখিল করব, যখন তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দিব যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে'। (সুরা নীসার আয়াত ৫৬)

'নিশ্চয় আল্লার নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফুরি করে, সুতরাং তারা ইমাম আনে না'। (৮/৫৫)

'হে মুমিনগণ! মুশকিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মজজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর তবে আল্লা নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাব মুক্ত করে দিবেন...'। (৯/২৮)

সুতরাং কুরান থেকে দেখলাম প্রিয়াঙ্কার পিতা-মাতা, ভাই -বোন সকল আত্মীয় অপবিত্র ও নিকৃষ্ট জীব। তারা সকলেই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে

এবার দেখবো কুরান তরুণীটিকে কী মর্যাদা দিল।

'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা গমন কর এবং স্বীয় জীবনের জন্যে পাথেয় পূর্বেই প্রেরণ কর এবং আল্লাকে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, তোমাদের সবাইকে তার মুখোমুখি হতে হবে এবং বিশ্বাসীগণকেও সুসংবাদ প্রদান কর'। (সুরা বাকারার/২২৩)

কুরান বলছে তরুণীটি স্বামীর জন্য শস্যক্ষেত্র। তার স্বামী তার সঙ্গে যে ভাবে ইচ্ছা ভোগ করতে পারবে। তাফসীর ইবনে কাসীরের এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে বলা হচ্ছে, এরপর আল্লাতালা বলেন তোমাদের স্ত্রী ক্ষেত্র বিশেষ অর্থাৎ সন্তান বের হওয়ার স্থানে তোমাদের যেভাবে চাও তোমাদের ক্ষেত্রে এসো। নিয়ম ও পদ্ধতি আলাদা হলেও স্থান একই অর্থাৎ সম্মুখে করে অথবা তার বিপরীত। সহীহ বুখারী শরীফে ইহুদিরা বলত যে সম্মুখ দিয়ে সহবাস না করে যদি গর্ভবতী হয় তবে টেরা চক্ষুবিশিষ্ট সন্তান জন্ম লাভ করবে। তাদের একথার খণ্ডনে এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় স্বামীর এই ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। ইবনে জুরায়াস বলেন যে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুলুল্লা এই স্বাধীনতা দিয়েছে যে সম্মুখ দিয়ে আসতে পারে বা পিছন দিকে দিয়েও আসতে পারে, কিন্তু স্থান একটিই হয়। তাহলে প্রিয়াঙ্কাকে তার স্বামী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে। ইসলামে নারী ভোগ্যবস্তু। মুসলমান পুরুষ যে পদ্ধতিতে তৃপ্তি পান তা তিনি অবলম্বন করতে পারেন এবং যথেচ্ছ ভোগ করতে পারেন তার স্ত্রীকে।

৩। 'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, যেহেতু আল্লা তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এহেতু যে, তারা স্বীয় ধনসম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে, সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয় তবে তাদের সদুপদেশ দান কর এবং তাদের শয্যা হতে পৃথক কর ও তাদের প্রহার কর, অনন্তর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করো না'। (সুরা নীসা/৩৪)

প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তীকে তার স্বামী মারতে পারবে কুরান সে অধিকার দিয়েছে , কিন্তু আমরা শতভাগ নিশ্চিত এই আয়াত প্রিয়াঙ্কাকে বাংলায় বলা হয়নি। যত গভীরে প্রবেশ করবো ততই জানবো প্রিয়াঙ্কা কোন নরকে ঝাঁপ দিয়েছে।

৪। এবার দেখবো প্রিয়াঙ্কা কি তার স্বামীর একমাত্র স্ত্রী হয়ে থাকবে? উত্তর-না। (সুরা নীসা/৩)

'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়ের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা'।

তাফসীরে ইবনে কাসিরের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে।

ইমাম শাফিঈ কুরান কারিমের ব্যাখ্যাকারী হাদিস স্বরূপ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, রসুলুল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য একই সঙ্গে চারটির বেশি স্ত্রী একত্রিত করা বৈধ নয়। এর উপরেই উলামা-ই-কিরামের ইজমা হয়েছে। অতএব কোনো কোনো শিয়ার মতে তা ৯টি পর্যন্ত একত্রিত করা বৈধ। বরং কোনো কোনো শিয়ার মতে তা ৯টির বেশি একত্রিত করলেও কোনো দোষ নেই। তাদের মতে কোনো সংখ্যাই নির্ধারিত নেই। তাদের দলিল হচ্ছে রসুলুল্লাহর কাজ। যেমন সহীহ হাদিসে রয়েছে তার ৯ জন পত্নী ছিলেন। সহীহ বুখারী কাফের মুআল্লাক হাদিসের কোনো কোনো বর্ণনাকারী ১১ জন বলেছেন।

হযরত আনাসে আছে যে, 'রসুলুল্লাহ ১৫ জন স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তেরোজনের সঙ্গে তাঁর সহবাস হয়েছিল। একই সময়ে ১১ জন পত্নী তাঁর নিকট বিদ্যমান ছিলেন। রসুলুল্লাহ ৯ জন পত্নী রেখে মৃত্যুবরণ করেন। আমার পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, এটা একমাত্র রসুলুল্লাহর জন্য বৈধ ছিল। তার উম্মতের জন্য একই সঙ্গে ৪টির বেশি স্ত্রী রাখার অনুমতি নেই'।

(সূত্র তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে। পৃষ্ঠা-২৮০)

সুতরাং দেখা গেল প্রিয়াঙ্কার স্বামী ইসলাম অনুযায়ী আরও ৩টি বিবাহ করার অধিকার পেয়েছে। স্বামীকে ৩ জন নারীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার কথা প্রিয়াঙ্কা কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিল?

৫। ধরে নিলাম প্রিয়াঙ্কা বিবাহ মেনে নিল কিন্তু নীচের আয়াতগুলোকে কোনো ধার্মিক মুসলমান নারীও মেনে নিবে না।

'যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। (২৩/৫) নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না'। (২৩/৬)

প্রিয়াঙ্কার (আয়েশা সিদ্দিকা) স্বামী তার পাশাপাশি আরও ৩টি ও অসংখ্য দাসী গ্রহণ করতে পারবে। নিজের স্বামী যখন তার সামনে দাসী নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবে সেই মুহূর্তে প্রিয়াঙ্কার অনুভূতি কী হবে!

এবার আরও ভয়ংকর দিক তুলে ধরবো যা কখনো প্রিয়াঙ্কাকে জানানো হবে না।

'এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায় অর্থাৎ লুণ্ঠিত অন্য ধর্মের নারী— এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য— ব্যাভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও।' (২৪/৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরের বলা হয়েছে।

'অর্থাৎ যেসব নারীর স্বামী রয়েছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে হ্যাঁ কাফেরদের যেসব স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারাও তোমাদের জন্য বৈধ হবে'। মুসনাদ-ই-আহমাদে হজরত আবু সাঈদ খুদরীতে আছে, আওতাসের যুদ্ধে কতগুলো সধবা স্ত্রীলোক বন্দিনী হয়ে আসে। আমরা রসুলুল্লাহকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়। এসব কথা জামেউত, তিরমিযি, সুনান ইবনে মাজাহ, সহীহ মুসলিম, তাবরানী প্রভৃতি হাদিসে আছে (খায়বার যুদ্ধ)। পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল এ আয়াতে দলিল গ্রহণ করে বলেন যে, দাসীকে বিক্রি করে দেওয়ার মানে হচ্ছে তাঁর স্বামীর পক্ষ হতে তালাক প্রাপ্তি। হজরত ইব্রাহিমকে এ মাসালাটি জিজ্ঞেস করা তিনি হলে হজরত আব্দুল্লাকে এই ফতোয়াটিই বর্ণনা করে এ আয়াতটি পাঠ করেন। অন্য সনদ দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হজরত আব্দুল্লা ইবনে মাউসুদ বলছেন, 'যখন কোনো সধবা নারী বিক্রিতা হয় তখন তার দেহের বেশি হকদার হচ্ছে তার মনিব'। হজরত উবাই ইবনে কাব, হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লা এবং হজরত আব্বাসেরও ইবনে ফতোয়া এই যে, তার বিক্রি হওয়ার মানে হচ্ছে তালাক প্রাপ্তি। —তাফসীরে ইবনে কাসীর (অনুবাদ ড. মুজিবর রহমান)

৭। প্রিয়াঙ্কার স্বামী যদি জিহাদ করে তবে সেই জিহাদে আয়েশার পিতা-মাতা, ভাই-বোন আক্রান্ত হতে পারে। তার কাফের পিতা-মাতাকে দাস-দাসী বানিয়ে রাখতে পারবে আয়েশার শ্বশুরবাড়ি। আয়েশার মা-বোনকে গনিমতের মাল বানিয়ে বেচা-কেনা করার অধিকার ও বৈধতা তার শ্বশুরবাড়িকে ইসলাম দিয়ে দিয়েছে। মুসলমান মুজাহিদরা ভাগ বণ্টনের পরে তার মা-বোনের সঙ্গে সহবাস করতে পারবে। মুসলমানদের হাতে বন্দি হবার পর তার পিতার সঙ্গে তাঁর মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এমনকী নারীদের সঙ্গে স্বামীর বিচ্ছেদ হয়ে যায় ইসলামি শরিয়া হুকুম অনুযায়ী। তার পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় মুসলমানরা তার মাকে তুলে নিয়ে ভোগ করতে পারবে, এই কথা কি জানতো প্রিয়াঙ্কা?

না, জানে না।

৮। তাকে কোনো দিন এসব ইসলামি হুকুম জানানো হবে না। নওমুসলিম কাউকেই এসব ইসলামি হুকুম জানানো হয় না। সজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের আসল রূপ গোপন করা হয় নওমুসলিমের কাছে। এভাবে লাভ জিহাদ চালিয়ে হিন্দু থেকে মুসলমান করা হয় আরো বেশি মুসলমান জন্ম দেওয়ার জন্য। এসব নওমুসলিম তাদের কাছে শুধু মাত্র তাদের কাছে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মেশিন ছাড়া আর কিছুই না। সরল অল্পবয়সি মেয়েগুলো প্রেমের ফাঁদে পড়ে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের ফিরে যাওয়ার পথ থাকে না। □

উত্তরপ্রদেশে বিয়ের জন্য ধর্ম পরিবর্তন বৈধ নয়

উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই আইনি পদক্ষেপ মেয়েদের স্বস্তি দিয়েছে। তাদের প্রতি সুবিচারের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে, সমগ্র দেশে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং তা কঠোরভাবে বলবৎ হবে এই আশা করা যায়।

সুতপা বসাক ভড়

এ পর্যন্ত 'লাভ-জেহাদ'-এর বলি হয়েছে অনেক হিন্দু মেয়ে তথা হিন্দু পরিবার। মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে, ভুলিয়ে নিকাহ্ করেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। এর উদ্দেশ্য একটি হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে তার দ্বারা হিন্দুর শত্রু উৎপন্ন করা। খুবই নিষ্ঠুর এই পদ্ধতিটি অনেক বছর ধরে চলে আসছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন অনেক ঘটনাকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। অহিন্দুদের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে সেখানে। যারা ওই ধরনের ঘটনাবলীকে অতিরঞ্জিত করে লিখেছে, তারা প্রায় সবাই হিন্দু বিরোধী এবং তৎকালীন শাসকদের কৃপাপুষ্ট। তারা তাদের অন্নদাতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা এসবকিছু জেনেশুনে তাদের বর্ণিত ঘটনাবলীকে অমোঘ সত্য জ্ঞান করে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন পরিচ্ছদে স্থান দিয়েছি। এতবছর ধরে অসত্য ঘটনাগুলি আমাদের মনের মধ্যে বিশেষ পরিকল্পনা করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা অনেকেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু তাঁদের মতামতকে ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘসময় পর্যন্ত কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র, সাহিত্য, প্রচারমাধ্যম, ইন্টারনেট ইত্যাদি সেই একই কাজ আরও সূক্ষ্ম, মনোগ্রাহীরূপে পরিবেশন করছে। উদ্দেশ্য, সমাজের সহানুভূতি ও সমর্থনলাভ করা। সমাজের সর্বস্তরের হিন্দু মেয়েরা এর শিকার। এই সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য শিকারিরা সদা তৎপর। এই ঘটনা কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বস্তরে ঘটে চলেছে। এই নির্যাতিতা মেয়েদের করুণ অবস্থার কথা সামনে আনা হয় না। প্রেমের জালে আটকে পড়া মেয়েরা যখন কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়, তখন অনেক দেরি হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই ওই জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। অতি সম্প্রতি, প্রয়াত সংগীতকার ওয়াজিদ খানের স্ত্রী কমলরুখ খান জানিয়েছেন যে তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবার তাঁকে ক্রমাগত অত্যাচার করেছে, কারণ তিনি ধর্ম পরিবর্তন করেতে চাননি। তাঁর সন্তানদের পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কমলরুখ খান ও ওয়াজিদ খান কলেজজীবন থেকে প্রেম করেছেন এবং বিয়ে করেছেন। ইনস্টাগ্রামে কমলরুখ খান তাঁর সঙ্গে হওয়া ঘটনাগুলি জানিয়েছেন।

'লাভ-জেহাদ'-এর মতো জঘন্য ষড়যন্ত্রকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার লাভ-জেহাদের বিরুদ্ধে আইন করার জন্য অতি সম্প্রতি জোরজবরদস্তি ধর্মপরিবর্তনের বিরুদ্ধে অধ্যাদেশ জারি করেছেন। এর ফলে নাম লুকিয়ে বিয়ে (লাভ-জেহাদ) করার জন্য ১০ বছরের শাস্তি হবে। এই অপরাধে জামানত পাওয়া যাবে না। অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে বিয়ে বা ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য জেলাধিকারীর থেকে অনুমতি নিতে হবে যে ধর্ম পরিবর্তন জোর করে, চাপ দিয়ে, লোভ দেখিয়ে বা চালাকি করে করা হচ্ছে না। অনুমতি নেবার ২ মাস আগে নোটিশ দিয়ে সব বিস্তারিত ভাবে জানাতে হবে। এরকম না করলে ৬ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত শাস্তি হবে এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। যদি কোনো মেয়েকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য জোর করা হয়, তাহলে সেই বিয়ে অমান্য করা হবে।

উত্তরপ্রদেশ সরকার 'লাভ-জেহাদ'-এর বিরুদ্ধে প্রথম অধ্যাদেশ এনেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষরা ধর্ম গোপন করে হিন্দু মেয়েদের প্রেম জালে ফাঁসানোর অনেক ঘটনা ঘটার জন্য এই ব্যাপারে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি সমাজের মধ্যে বারবার উঠে আসছিল। মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশেও এই ধরনের আইনের জন্য দাবি উঠেছে। উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথ সিংহ জানিয়েছেন যে সরকার 'উত্তরপ্রদেশ বিধি বিরুদ্ধ ধর্মপরিবর্তন প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০২০' এনেছে, যা রাজ্যের আইন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এবং মহিলাদের সুবিচার দেওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক।

জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করার চেষ্টা হলে ১০ বছর পর্যন্ত শাস্তি হবে এবং ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। এছাড়া, জোর করে গণধর্মান্তরণ করলে ১০ বছর পর্যন্ত শাস্তি এবং ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। অতি সম্প্রতি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে যে, কেবলমাত্র ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বিয়েকে অবৈধ মানা হবে। প্রিয়াংশী ওরফে সমরিন এর মামলায় আদালত জানিয়েয়ে যে, বিয়ে করার জন্য ধর্ম পরিবর্তন স্বীকার করা হবে না।

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

বর্ণ চতুষ্টয় ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

চার বর্ণ :

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার দুটো মূল ভিত্তি রয়েছে। একটি আশ্রম ব্যবস্থা, অন্যটি বর্ণ ব্যবস্থা। আশ্রম ব্যবস্থার বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে বর্ণ ব্যবস্থার আলোচনা করব।

বর্ণ কী? লিখিত অক্ষরকে বর্ণ বলে। উদাহরণ রূপে 'ক' 'খ' ইত্যাদি হচ্ছে বর্ণ। রং-কেও বর্ণ বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ রূপে শ্বেতবর্ণ, শ্যামবর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থায় বর্ণ মানুষের স্বভাব অনুসারে হয়ে থাকে।

স্বভাব কী? মানুষের গুণধর্মই হলো মানুষের স্বভাব। মানুষের পরিচয় মানুষের স্বভাব দ্বারাই হয়ে থাকে। কেউ দয়ালু , কেউ ক্রোধী, কেউ সাহসী, কেউ ভীরু , কেউ স্বার্থপর, কেউ উদার হয়। এরকম অনেক প্রকারের মানুষ হয়ে থাকে। এই গুণ মানুষ তার স্বভাব থেকেই পেয়ে থাকে। এই স্বভাব অনুসারেই মানুষের বর্ণ নিশ্চিত হয়।

মানুষের স্বভাব জন্মজন্মান্তরের কর্মের প্রতি তার মনের সম্বন্ধ অনুসারে তৈরি হয়। মানুষকে জীবন যাপনের জন্য অনেক প্রকারের কাজ করতে হয়। একটা মুহূর্তও মানুষ কাজ না করে থাকতে পারে না। এই কাজ শারীরিক ও বৌদ্ধিক দু'ভাবেই হয়। উদাহরণ স্বরূপ খাওয়া, চলা, পোশাক পরা এগুলি শারীরিক কাজ, কিন্তু অধ্যনয় করা, সমস্যা মেটানো ইত্যাদি বৌদ্ধিক কাজ। এসব কর্মের পরিণাম থাকে, যাকে কর্মফল বলা হয়। কর্ম করলে কর্মফল হবেই। ভালো কর্মের ভালো ফল, খারাপ কর্মের খারাপ ফল হয়। মানুষের মন এমন হয় যে তার ভালো ফল তো চাই কিন্তু খারাপ ফল চাই না। কিন্তু এমনটা হয় না। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। এই জন্মে যদি ভোগ না হয় তবে দ্বিতীয় জন্মে তা সঞ্চিত কর্মরূপে সঙ্গে এসে থাকে। এই কর্মগুলোর ভিত্তিতেই বর্ণ তৈরি হয়। কর্মের সঙ্গেই গুণও মানুষ স্বাভাবিক রূপেই পেয়ে থাকে। গুণ তিনিটি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণানুসারে বর্ণ তৈরি হয়। গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষের বর্ণ প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

এর অর্থ হলো যে, প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের বর্ণ হয়ে থাকে। যত রকম মানুষ তত রকম বর্ণ । কিন্তু আমাদের পারস্পরিক ব্যবস্থায় বর্ণ প্রথমে গুণকর্মের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। পরে কুলের অনুসারে নিশ্চিত হয়ে আসছে। যে বর্ণের সাধারণ ঘরে জন্ম হয়েছে সেই বর্ণ তাদের সন্তানেরও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বভাব অনুসারেই বর্ণ নিশ্চিত হয়। পারস্পরিক রূপে যদি দেখা যায় তবে বর্ণব্যবস্থা বিয়ে, আচার এবং ব্যবসার ভিত্তিতেই স্থাপিত হয়েছে। বর্ণ অনুসারেই ব্যবসা করতে হয়। বর্ণ অনুসারেই বিয়ে করতে হয় এবং বর্ণের অনুসারেই আচারের পালন করতে হয়। সমাজকে সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত করতে এই তিন বিষয়ে বর্ণব্যবস্থার পালন শক্তভাবে করার আগ্রহ করা হয়েছে। তবু এই ব্যবস্থাকে বিয়ের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হতে দেখা যায়। কিন্তু আচার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সামান্য শিথিলতা মেনে নেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, অনুলোম বিয়ের হিসেবে বর্ণান্তর বিয়ে প্রচলিত রয়েছে। অনুলোম বিয়ের অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ বর্ণের পুরুষ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র কন্যার সঙ্গে বিয়ে করতে পারে। ক্ষত্রিয় বর্ণের পুরুষ বৈশ্য বা শূদ্র কন্যার সঙ্গে বিয়ে করতে পারে। বৈশ্য বর্ণের পুরুষ শূদ্র কন্যার সঙ্গে বিয়ে করতে পারে। এই সীমিত রূপে বর্ণব্যবস্থা হচ্ছে নমনীয়। দুই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রী এবং পুরুষের সন্তানকে বর্ণসংকর বলা হয়ে থাকে। মহাভারতে এমন বর্ণসংকরের অনেক প্রকার বলা হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই বর্ণসংকরদের ব্যবসাও আগ্রহপূর্বক নিশ্চিত করা হয়েছে। যদি মানুষ ব্যবসার বদল করে তবে তার বর্ণও পালটে যায়। আচার ত্যাগ করার সামান্যতমও অনুমতি নেই।

যে বিচারধারা সমাজকে জীবন্ত একক সত্তা মনে করে এবং সমাজ ও ব্যক্তির মাঝে অঙ্গাঙ্গীর সম্বন্ধ বলে থাকে সেখানে সমাজ হচ্ছে অঙ্গী এবং ব্যক্তি হচ্ছে অঙ্গ। ব্যক্তি সমাজের সুস্থিতি ও সুদৃঢ়তার জন্য নিজেকে সামাজিক ব্যবস্থাবলির সঙ্গে সময়োচিত করবে। ব্যক্তি নিজের জীবন সমাজের জন্য সমর্পিত করবে এবং নিজেকে ধন্য মনে করবে। এমন সমাজেই বর্ণব্যবস্থার প্রয়োজন থাকে। যে সমাজে ব্যক্তিকেই স্বতন্ত্র ও সর্বোপরি মনে করে এবং সমাজকে কেবল ব্যবস্থাই মনে করা হয়, সেখানে বর্ণব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন থাকে না। আজ ভারতে বর্ণব্যবস্থার যে উপেক্ষা, বর্জন ও দুরবস্থা দেখা যাচ্ছে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ রচনার কারণেই হয়েছে। ভারতীয় সামাজ ব্যবস্থাকে একবার নিশ্চিত হয়ে যাবার প্রয়োজন আছে যে তার স্বচ্ছন্দ জীবন ব্যবস্থার দরকার, না পরিবার ভাবনা সমৃদ্ধ করার। যদি আমরা পরিবার ভাবনাসমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা চাই তবে, আমাদের বর্ণব্যবস্থাকে স্বীকার করতে হবে।

এখানে এমন সমাজব্যবস্থা চাই যে অনেক প্রকারে সেটা লাভদায়ী হয়, এমনটা মনে করেই সমস্ত বিষয়েরই অবতারণা করা হয়েছে এটা স্পষ্ট।

ব্রাহ্মণবর্ণ :

ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠবর্ণ মানা হয়। জ্ঞান ও সংস্কার হচ্ছে এর ক্ষেত্র। যে কোনো সমাজেই জ্ঞান ও সংস্কারের স্থাপনা ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকেই হয়। যজ্ঞ ও জ্ঞান সাধনা দ্বারা সে সমাজের সেবা করে থাকে। ব্রাহ্মণকে তার পবিত্রতা ও শুদ্ধি সুরক্ষিত রাখা দরকার। এটা তার আচার ধর্ম। ব্রাহ্মণের দিনচর্যা শাস্ত্রানুসারে হওয়া উচিত। তার যজ্ঞ করা এবং করানো উচিত। অধ্যাপনা করা উচিত। ভৌতিক উৎপাদন করা উচিত নয়। কিন্তু আজ ব্রাহ্মণ তার বর্ণের

আচার পালন করে না, শুদ্ধি ও পরিত্রতা সুরক্ষা করে না। সমাজকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করা ব্রাহ্মণের কাজ। যখন সে জ্ঞান সাধনা ছেড়ে দেয় তখন সমাজের ক্ষতি হয়।

সবচাইতে বেশি অব্যবস্থা হয়েছে পেশার ক্ষেত্রে। ব্রাহ্মণের কাজ পড়ানো। পয়সা নিয়ে পড়ানো ব্রাহ্মণকে জ্ঞানের ব্যবসায়ী বলা হয়েছে। আজ ব্রাহ্মণরা পয়সা নিয়ে পড়ায়। তারা বৈশ্যবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়েছে। এমনকী সে পড়াবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে না। সে চাকরি করে। চাকরি করা শূদ্রের কাজ। ব্রাহ্মণ আজ শূদ্র হওয়াও স্বীকার করে নিয়েছে। সে নিজের ক্ষতি তো করেছেই তদুপরি জ্ঞানের পবিত্রতাও নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের চাকর হবার কারণে বিদ্যার গৌরব নষ্ট হয়েছে। সে সমাজে বিদ্যা, স্বাধ্যায়, পবিত্রতা, শুদ্ধতা থাকে না, সেই সমাজের অধোগতি স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণের বণিক হওয়ার কারণে সমাজ জ্ঞাননিষ্ঠের স্থানে অর্থনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। পবিত্রতা না থাকার দরুন সমাজ ভোগপ্রধান এবং কামপ্রবণ হয়ে পড়েছে। ভোগ প্রবণতা কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যেই রয়েছে এমনটা নয়। চার বর্ণের পুরো সমাজই ভোগপ্রবণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এতে ব্রাহ্মণের দায়িত্ব সবচাইতে বেশি। কারণ সংসারের নিয়ম হচ্ছে বড়ো ও শ্রেষ্ঠরা যেমনটা করে থাকেন তেমনটাই কনিষ্ঠরাও করে থাকে। সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে বড়োদের আচরণই প্রেরণা ও পথপ্রদর্শক। ব্রাহ্মণরা যদি জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা না রাখে তবে আর সবাই কী করবে? তারা তো তাঁদের অনুসরণই করবে। শ্রেষ্ঠদের পতনের জন্য সমস্ত সমাজের পতন হয়।

ব্রাহ্মণরা বিদ্যাকে পণ্য অর্থাৎ ব্যবসার বস্তুতে পরিণত করেছে। কিন্তু তাদের আর্থিক ক্ষেত্রের অপরাধ শুধু এটুকুই নয়, তারা অন্য বর্ণের পেশাও নিয়ে নিয়েছে। আজ ব্রাহ্মণ চাকরিও করছে, ব্যবসা তো চালাচ্ছে, কারখানাও চালাচ্ছে, মজদুরিও করছে। এতে তারা অর্থার্জনের ভালো সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। যে তপশ্চর্যা ছেড়ে দেয় তার সাংস্কারিক তথা আধ্যাত্মিক হানি হয়, কিন্তু যার ব্যবসা কেড়ে নেওয়া হয় তার তো সবপ্রকারের হানি হয়। জ্ঞান ও সংস্কারের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক না থাকায় চারিত্রিক অধঃপতনও হয়ে থাকে এবং পেশা কেড়ে নেবার দরুন আর্থিক অথবা ভৌতিক ক্ষতিও হয়ে থাকে। পরম্পরাগত ভাবে

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা রয়েছে। তার ক্ষেত্র হলো জ্ঞানের ক্ষেত্র। সেই সবার পথপ্রদর্শক ও প্রেরণার ভূমিকা পালন করছে। সে জ্ঞানের উপাসকও থেকেছে। এ কারণেই যে যখন নিজের স্থান থেকে চ্যুত হয় তখন তার কোনো পথপ্রদর্শক অথবা তাকে বাধা দেবার কেউ থাকে না। তাকে তার অপেক্ষা নীচুস্তরের সব লাভ উপভোগ করতে পারে। অবস্থা এমন হয় যে তার মূল কাজ তো কেউ করতে পারে না, কিন্তু সে অপরের কাজ করতে পারে।

এর পরিণাম এই হলো যে জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ হলেও বৃত্তি ও ব্যবসায়ের দিক থেকে সে ব্রাহ্মণ নয়। জন্মগত ভাবে ব্রাহ্মণ হওয়াতে কোনো গৌরব নেই। বৃত্তি ও পেশার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ হওয়াতে গৌরব আছে। এখন জন্ম অর্থাৎ কুল ও বৃত্তি এই দুটোতে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের এমনটা যখন হলো তখন অন্য বর্ণেরও হয়েছে। অধ্যয়ন অধ্যাপনা করার জন্য অন্য বর্ণের লোকও তৈরি হয়ে গেলেন। কিন্তু মুল বৃত্তি হচ্ছে বণিকের, আর ব্রাহ্মণরা যখন অধ্যাপনাকে শূদ্রের কাজে পরিণত করে দিয়েছে, তখন বৈশ্যরাও জ্ঞানের ব্যবসা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এখন কোন বর্ণের ব্যক্তি কোন কাজ করবে তার নিশ্চয়তা থাকল না।

ব্রাহ্মণের একটা কাজ হচ্ছে পুরোহিতের কাজ। এখনও ওই কাজ জন্মজাত ব্রাহ্মণরা করে চলেছেন। কিন্তু স্বয়ং যজ্ঞ করার কাজ নেই এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করিয়ে থাকেন, কিন্তু সব মিলিয়ে যজ্ঞের প্রচলনই সমাজে কম হয়ে গিয়েছে। যা-ও অবশিষ্ট আছে তা ব্রাহ্মণদের জিম্মায় রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এখন পৌরোহিত্য করে থাকেন। মন্দিরে পুজারির কাজও তাদেরই আছে। উৎসব অনুষ্ঠানে রান্নার কাজও ব্রাহ্মণের ছিল। এই দুটো কাজই এখন অন্য বর্ণের লোক করতে লেগেছেন। তবু ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য এখনও সমাপ্ত হয়নি। কিন্তু এখন পৌরোহিত্য হোক বা পূজারির কাজ, বেদ পাঠ হোক বা রান্নার কাজ ব্রাহ্মণের জন্য এটা অর্থার্জনের জন্য ব্যবসাতে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

ভারতকে সনাতন রাষ্ট্র বলা হয়েছে এবং ভারতের হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। সনাতন কথার অর্থ হচ্ছে যা স্থান ও কালের মধ্যে নিরন্তর টিকে থাকে! এই সনাতনতারই প্রমাণহচ্ছে যে এখনও এমন ব্রাহ্মণ অবশিষ্ট আছেন যাঁরা শুদ্ধি ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলেছেন, তাঁরা বিনা শুল্কে অধ্যাপনা করে থাকেন, বেদাধ্যয়নের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এখনও তারা জ্ঞানের গরিমাকে হেয় হতে দেন না। ভারতীয় সমাজের আশা এখনও তণাদের কারণেই সমাপ্ত হয়ে যায়নি।

ক্ষত্রিয় বর্ণ :

বর্তমানে ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতিষ্ঠা বৈশ্যদের চাইতে কম হয়ে গিয়েছে। শস্ত্র ধারণ করা দুর্বলের, বিশেষরূপে গোসম্পদ, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীজাতির রক্ষা করা, দুষ্টদের দণ্ড দেওয়া, যুদ্ধে পরাক্রম দেখানো, দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করা হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কাজ। আজ শাসনক্ষমতা ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে চলে গিয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে এখন আর পরম্পরাগত ভাবে রাজা থাকছে না। নির্বাচনের মাধ্যমে এখন সরকার গড়া হয়, এজন্য ক্ষত্রিয়ের একটা কাজের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন সকল বর্ণের নতুন বিশেষত্বকে নিয়ে তারা চাকরি করতে লেগেছেন। এর অর্থ হচ্ছে তারাও এখন শূদ্রে পরিবর্তিত হচ্ছেন। সেনাবাহিনীতে ভর্তির সারিতেও তারা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এমনটা বলা যায় না। বড়ো বড়ো রাজমহল এখন হোটেলে পরিবর্তিত হয়েছে। এর অর্থ এই হলো যে তারা এখন ব্যবসা করতে লেগেছেন। অর্থাৎ তারা বৈশ্য বর্ণে পরিবর্তিত হচ্ছেন। গোব্রাহ্মণ প্রতিপালকের কাজ তারা কবেই ছেড়ে দিয়েছেন। শস্ত্র ধারণ করাও এখন আর নেই।

ক্ষত্রিয় বর্ণের পতন ও বিঘটনের কারণে এখন সমাজের পরাক্রম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আইনও এখন সর্বসাধারণকে শস্ত্র রাখা ও ব্যবহার করবার অনুমতি দেয় না। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সমূহে শস্ত্রবিদ্যা শেখানো হয় না। এমতাবস্থায় শাসন করবার বৃত্তি দাদাগিরিতেও পরিবর্তিত হচ্ছে।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক

একুশের ভাষা আন্দোলন
এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

প্যারি শহরের বিশ্ববিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়ামে নানান ভাষার ইনফর্মেশান বুকলেট বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিস, চাইনিজ, আরবিক, জাপানি— এমনকী মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের ভাষা হিব্রুও আছে। নেই কেবল হিন্দি বা বাংলা। জনসংখ্যার বিচারে বাংলা বিশ্বে পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই ভাষার জন্যই ১১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। দীর্ঘ গণআন্দোলনের ফলে ওই দিন আটজন ইসলাম মতাবলম্বী বাঙ্গালির মৃত্যু হয়। ভাষা আন্দোলন হিসেবে পরিচিত এই আন্দোলন কতটা বাংলাভাষাকে নিয়ে ছিল, আন্দোলনের প্রকৃত কারণ এবং চরিত্রই বা কী ছিল বা কেমন ছিল? এমনকী স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মূল কারণ এই ভাষা আন্দোলন ছিল কী না সেসব নিয়ে নানা প্রশ্ন বিভিন্ন সময় উঠেছে। বর্তমান নিবন্ধে আমি সেসবের মধ্যে যাব না। এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পর তার সম্পর্কে কোনো উপসংহার টানারও ইচ্ছে আমার নেই। কোনো মতের হয়ে ওকালতি নয়, কেবল সাক্ষ্যটুকুই দিতে চাই।

আমি ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হই গত শতাব্দের পাঁচের দশকে। আমার সময় জগন্নাথ কলেজ ছিল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ। আর জগন্নাথ হল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনিবাস। আমি আই.এ. পড়তে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হই। ঢাকায় আমার ছাত্রাবস্থায় ভাষা আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। পরিণতি লাভ করেনি। তখনো কেউ এই আন্দোলনে শহিদ হননি।

সেই সময় জগন্নাথ কলেজের প্রাঙ্গণে প্রায়ই বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবিতে সভা হতো। সভার আগে কোরান থেকে আরবিতে পাঠ করা হতো। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাংলাভাষার মর্যাদার দাবিতে আরবি ভাষা ব্যবহারের কী দরকার? উপস্থিত মানুষজনের কেউ তো এ ভাষা বোঝেই না। পরে ভেবে দেখেছি যারা বক্তা বা সভা আয়োজনকারী তাদের সকলেরই নাম আরবি বা ফারসিতে। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনে যারা শহিদ হন তাঁদের নামের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

এই আন্দোলন নিয়ে যা লিখছি তার অনেকটাই আমার নিজের চোখে দেখা বা অন্যের মুখে শোনা। জিন্না একবার ঢাকাতে আসেন। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ওই সময় ঢাকা হলের প্রভোস্ট (পদটির নাম অন্য কিছুও হতে পারে) আমার পরিচিত ছিল। তাঁর মুখ থেকেও অনেক কিছু শুনেছি। এছাড়া আমাদের সিনিয়র দাদাদের থেকেও অনেক কিছু শুনেছি। এই আন্দোলনের যাঁরা প্রভাবশালী নেতা তাঁদের একজনের এক বোন আমাদের স্কুলে আসতো ভাষা আন্দোলনে বাঙ্গালি হিন্দু ছাত্রীদের সমর্থন পেতে। জগন্নাথ কলেজে আমার এক হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু জোটে। তাদের একজন শেরওয়ানি পরে আসতো। চাপা পাজামার ওপর লম্বা পাঞ্জাবি। মাথায় চামেলি তেল মাখতো। ওর নামের শেষে লক্ষ্ণৌভি, অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ থেকে আসা প্রকাশ পেত।

জিন্নাহ সাহেব ঢাকাতে এসে ময়দানে বক্তৃতায় বলেন, Urdu should be the state language of Pakistan। তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে কলরব ওঠে No No। স্বভাবতই জিন্নাহ সাহেব খুব রেগে যান। বলা যায় ভাষা আন্দোলন ওই No দিয়েই শুরু।

সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি হল ছিল। প্রত্যেক হলের এক একজন প্রভোস্ট থাকতো। ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলে কেবল হিন্দু ছাত্ররা থাকতো। সালিমুল্লা হল ও ফজলুল হলে থাকতো মুসলমান ছাত্ররা। ১৯৪৮ সালে জিন্না কেবল মুসলমান হল দুটির প্রভোস্টদের ডেকে পাঠান, হিন্দু হলের প্রভোস্টদের ডাকেননি। সালিমুল্লা হলের সেই সময়ের প্রভোস্ট নজরুল ইসলাম পরে স্বাধীন বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন (১৭ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত)। মুজিবুর রহমান তখন পাক জেলে বন্দি। নজরুল ইসলাম ছিলেন অর্থনীতির ছাত্র।

যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই ভাষা আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে জেনেছি তাঁদের একজন ঢাকা হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ছিলেন। আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশের অত্যাচারও সহ্য করেন। তাঁর মতে এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন মুনির চৌধুরী। অনেকেই মনে করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৪৮ সালে আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তামাদ্দিন মজলিস গঠন থেকে। তামাদ্দিন শব্দটা বাংলা নয়। অনেককে ব্যঙ্গ করতে শুনেছি এর উদ্দেশ্য তামাম দিন মজা করা। সত্যিকারের এই আন্দোলন হয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। বাংলাভাষা আন্দোলনের এই স্মরণীয় দিনটির বাংলা তারিখ কেউ মনে

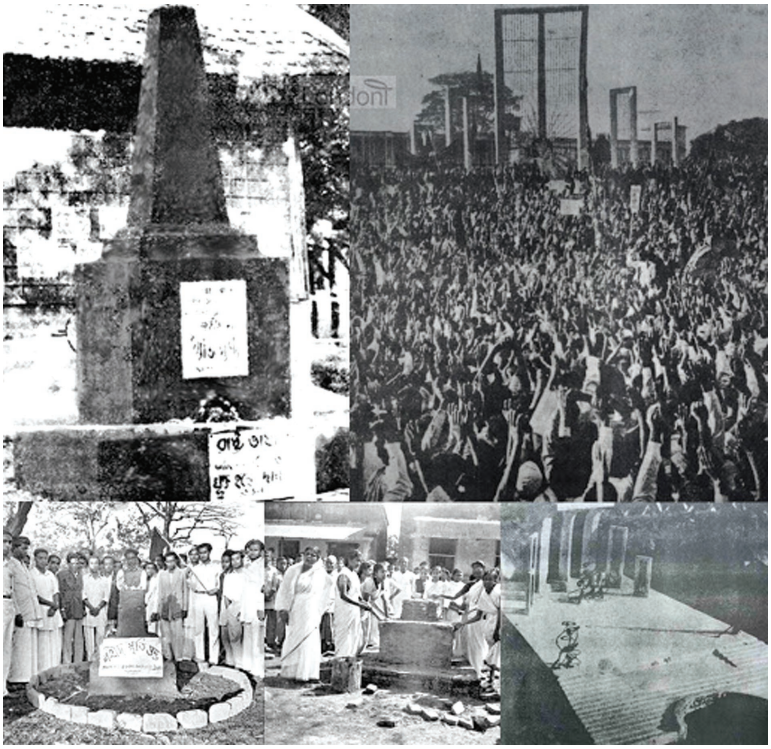

রাখেনি। বাংলার জন্য ৮ ফাল্গুন তারিখটা পালন করা ২৫ বৈশাখের মতো হতে পারতো।

জিন্না ১৯৪৮-এ ঢাকাতে দুটি সভায় ভাষণে উর্দুতে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। ওই বছরেই তাঁর মৃত্যুর পর লিয়াকত আলি প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৪৯-৫০ এই সময়কালে আমি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলাম। বাঙ্গালি ফজলুর রহমান তখন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু তিনি উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, উর্দু পাকিস্তানে পঞ্জাবি, সিন্ধি, পুস্তু, এমনকী জিন্নাহর নিজের গুজরাতির মতো নিজস্ব ভাষাই নয়। আমীর খসরু, মির্জা গালিবের ভাষা উর্দুর জন্মই দিল্লিতে।

১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারির আত্মবলিদানের সময় আমি ঢাকা ছেড়ে এসেছি। যা লিখছি অনেকটাই বন্ধু মনোরঞ্জন সরকারের কাছে শোনা। মুনির চৌধুরী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই সি এস করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আবুল কাশেমও অধ্যাপক ছিলেন।

দেশভাগের আগে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তবঙ্গে মুসলিম লিগ শাসকদল ছিল। তখন সরকারি আনুকূল্যে অনেক মুসলমান চাকরি পায়। হিন্দুদের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পেত না। এমনকী প্রেসিডেন্সি কলেজেও এমনটা ঘটেছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে তা কিছুটা তুলনীয়। এখন যেটা মৌলানা আজাদ কলেজ সেটার নাম ছিল ইসলামিয়া কলেজ। শিক্ষিত মুসলমানরা পার্কসার্কাস অঞ্চলে থাকতো। সেটাই তখন মুসলমানদের বালিগঞ্জ। উঁচু পাঁচিল তোলা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ছিল ছাত্রীদের কলেজ যেখানে মুসলমান আবাসিক ছাত্রীরা পড়তে পারতো। এছাড়া গ্রাম থেকে আসা মুসলমান ছাত্রদের জন্য কারমাইকেল ছাত্রনিবাস তৈরি হয়। দেশভাগ হবার পর এদের অনেকেই পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। কবির চৌধুরী, মুনির চৌধুরীরা হয়তো দু-তিন প্রজন্মের শিক্ষিত। তবে অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের আলোকপ্রাপ্ত সন্তান। অন্যদিকে বিহারি মুসলমানরা বাংলাদেশে বেশিরভাগ অশিক্ষিত হলেও হায়দরাবাদ, পঞ্জাব থেকে আগতরা ছিল শিক্ষাদীক্ষায় অনেক উন্নত। এদের মাতৃভাষা উর্দু না হলেও language affinity-র জন্য বাংলা থেকে উর্দু শেখাটা তাদের কাছে অনেক বেশি সহজ। ভাষা আন্দোলনের ব্যাপ্তি তাই ছাত্র ও শিক্ষিত বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হলেও পশ্চিম ও যুক্ত পাকিস্তনের রাজধানী তখন করাচি। উচ্চপদে নিয়োগ পেতে হলে উর্দু ছিল সুবিধাজনক অবস্থায়। ফলে সেই ভাষাটা রাষ্ট্র ভাষা হলে কেবল বাংলা জানা মুসলমানদের বিপদ। এরা উর্দু ভাষার বিরোধী নয়। এদের বক্তব্য 'উর্দু আমাদের চাচা। বাংলা আমাদের বাবা। ফজলুর রহমানের ইচ্ছা হয়েছে চাচাকে বাবা বলার। আমরা তা পারবো না।'

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের সীমিত অংশগ্রহণের মতো ভাষা আন্দোলনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বাঙ্গালিদের তেমন অংশগ্রহণ না করার প্রধান কারণ শিক্ষিত হিন্দুদের ভারতে চলে আসা। তথাকথিত নিম্নবর্গের হিন্দুরাও ভারতে তপশিলি সংরক্ষণের পর ভাগ্যান্বেষণে ভারতমুখী হয়। ফলে হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া প্রথম প্রজন্মের মুসলমান শিক্ষিতরা চাকরির প্রতিযোগিতায় উর্দু রাষ্ট্র ভাষা হলে হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌভি বা পঞ্জাবিদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এটা বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাংলাকে চাই।

'শিক্ষা চেতনা আনে'— এধরনের দেওয়াল লিখন অনেকেই দেখেছি। যেটা লেখা থাকে না তা হলো শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব অশিক্ষিত লোকেদের চেয়ে বেশি। কারণ শিক্ষিত হওয়ার অন্যতম কারণ অর্থ রোজগারের পথ সুগম করা বা চাকরি পাওয়া। তাই শুরু হয় শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। মুসলমানরা শিক্ষিত হলে চাকরি চাই। কিন্তু প্রতিযোগিতাতে না পারলে সংরক্ষণের দাবি ওঠে। তাই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই ভাষা আন্দোলনও তাই এক ধরনের চাকরি পাওয়ার জন্য সংরক্ষণের আন্দোলন।

দেশ বিভাগ যখন হয় তখন সরকারি কর্মচারীদের একটা অপশন দেওয়া হয়েছিল তাঁরা কোথায় থাকতে চান পাকিস্তানে না হিন্দুস্তানে। স্বভাবতই অনেক মুসলমান কর্মকর্তা পাকিস্তানে থাকার অপশন নিয়ে সপরিবারে ঢাকাতে চলে যান। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা সেখানকার স্কুল-কলেজে ভর্তি হয়। এরা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত নয়।ঢাকায় চাকুরিরত মুসলমানদের তিনভাগে তখন ভাগ করা যেত। প্রথম, যাঁরা সেখানে আগে থেকেই ছিলেন তাঁদের ছেলে-মেয়েরা কলেজিয়েট , আরমানিটোলা প্রভৃতি স্কুলে পড়ত এবং মেয়েরা পড়ত ইডেন ও কামরুন্নেষা স্কুলে। দুই, যারা অপশন নিয়ে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল। এছাড়া অনেকে যারা কলকাতার বাড়ি বিনিময় করে ঢাকার হিন্দুদের বাড়ি কেনে। এই তিন ধরনের মুসলমান বাঙ্গালিই প্রধানত বাংলাভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

ঢাকার ভাষা আন্দোলনের মতো অসমের শিলচরেও ১৯৬১-র ১৯ মে বাংলাভাষা আন্দোলন হয়েছিল। তাতে ১৫ জন বাংলাভাষী অসমীয় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। কমলা ভট্টাচার্য নামে একটি কিশোরীও ছিল তাদের একজন।

২১ ফেব্রুয়ারির ঢাকার শহিদরা যেমন সকলেই আরবি নামের মুসলমান বাঙ্গালি ছিলেন। শিলচর কাণ্ডে সকলে ছিলেন বাংলা নামের হিন্দু বাঙ্গালি। এই দুই আন্দোলনই ছিল ভাষার সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আন্দোলন। □

সঙ্ঘে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই

কৌশিক মুখোপাধ্যায়

একথা আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে পশ্চিমবঙ্গেও ক্রমশ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। কিন্তু সেটা হঠাৎ করে হয়নি, আর এস এস কার্যকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। সঙ্ঘের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য (বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৯, ৮ মার্চ) অনুযায়ী গত বছর উত্তরবঙ্গে বত্রিশ জায়গায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে তিন হাজার চারশো সাতষট্টি জায়গায় ভারতমাতার পূজা হয়েছে। এই সাফল্য পশ্চিমবঙ্গেও আগামীদিনে সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। সঙ্ঘের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন এই কোভিড পরিস্থিতিতেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবাকার্য করে গেছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কী? কা আদর্শে গড়ে উঠেছে এরকম একটি বৃহৎ সামাজিক সংগঠন? ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর জাতি (নেশন) গঠনের কোন উদ্দেশ্য সফলতার সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে সঙ্ঘ প্রায় একশো বছর ধরে?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মশক্তি প্রবন্ধে বলেছেন, 'নেশন একটি সজীব সত্তা। একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস একই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে, সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি-সম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা..., অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূল পত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমানকালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প— ইহাই জনসম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক মূল...।

আবার ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায় অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম ও ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি..., পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে— সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে।

আর এস এস এই জাতীয়বাদী ধারাটিকেই কর্মের মাধ্যমে অনুসরণ করেছে এবং করবে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ার (ডাক্তারজী) এর মতে সঙ্ঘ কোনো নোতুন কাজ করিতে চায় না, সে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন সমাজের সেবা করেছে সেরকম সেবা করার অনুপ্রেরণা জোগায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক এই কাজ করে চলেছে, প্রকাশ্যে কিন্তু প্রচার বিমুখতায়। আজকে ভারতবর্ষের জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে সঙ্ঘ হয়তো প্রচারের আলো পাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে, কিন্তু প্রায় ১০০ বছরের এই সংগঠন নীরবে কাজ করে চলেছে। বার বার সঙ্ঘের উপর রাষ্ট্রশক্তি আঘাত হেনেছে, ১৯৪৮-৪৯, ১৯৭৫-৭৬, এবং ১৯৯২ সালে। একে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সঙ্ঘশক্তি এমনই জিনিস তাকে আঘাত করা যায়, আর সেই আঘাতে সে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, কিন্তু ধ্বংস করা যায় না। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক লক্ষ শাখার মাধ্যমে সমাজ গঠনের ও দেশ গঠনের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে সঙ্ঘ, সমরসতার মন্ত্র শেখাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘের শীতকালীন শিবির (১৯৩৪, ওয়ার্ধা) চলাকালীন গান্ধীজী সেখানে যান ও ডাক্তারজীকে স্বয়ংসেবক সম্পর্কে জানতে চাইলে ডাক্তারজী বুঝিয়েছিলেন, স্বয়ংসেবক একজন নেতা, তিনি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গে প্রস্তুত। এখানে কেউ ছোটো-বড়ো নয়, সকলেই সমস্তরের। এখানেই গান্ধীজী দেখেছিলেন সঙ্ঘে কোনো অস্পৃশ্যতা নেই। তিনি অবাক হয়েছিলেন দেখে যে, সব জাতপাতের মানুষ একসঙ্গে থাকছে, খাচ্ছে। এখনও কোনো সঙ্ঘ শিবিরে গেলে এই চিত্রই ধরা পড়ে। ১৯৩৬ সালে পুনে শাখার মকর সংক্রান্তি উৎসবে ড. ভীমরাও আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি জানতে চান স্বয়ংসেবকেরা সকলেই ব্রাহ্মণ কি না। উত্তরে ডাক্তারজী বলেছিলেন যে, স্বয়ংসেবকেরা যখন আদর্শ প্রচার করছে, নতুন স্বয়ংসেবক জোগার করছে তখন তারা ব্রাহ্মণ, যখন শরীরচর্চা করছে ক্ষত্রিয়, যখন অর্থের হিসেব নিকেশ পরিচালনা করছে তখন বৈশ্য এবং বিভিন্ন শিবিরে যখন শৌচাগার পরিষ্কার করছে তখন শূদ্র।

অর্থাৎ সঙ্ঘে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। সকলেই এখানে সমান, এই ভাবনা সঙ্ঘের সাফল্যের কারণ। এমন হাজারো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে প্রমাণিত হয় সঙ্ঘে জাতপাতের কোনো স্থান নেই। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, জয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার , সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্ঘের কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি ও ভাবধারার প্রশংসা করেছেন।

সঙ্ঘ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, যারা ভারতের জাতীয় সমাজকে একত্রিত করে এগিয়ে চলার কাজ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের সেই নেশন ভাবনা যেন তাদের পাথেয়, প্রাচীন স্মৃতি-সম্পদ ও একত্রে বাস করার ইচ্ছা। দেশমাতৃকা ও তার সেবার ব্রত নিয়ে চলা সঙ্ঘের প্রার্থনায় তাই উচ্চারিত হয়। সঙ্ঘ নিরন্তর ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার কাজ করে চলেছে নীরবে একাগ্রচিত্তে।

ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটাই অবান্তর

রামানুজ গোস্বামী

যে কথা আগেই বলেছি যে, একামাত্র সংকীর্ণ ভোট-রাজনীতির কারণেই ভারতকে একটি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয় যাতে সংখ্যালঘু ভোটের (বিশেষত মুসলমান ভোট) সুবিধা নিয়ে সহজেই নির্বাচনে জয়লাভ করা যায়। একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। তা হলো এই যে, হিন্দু ভোটের বিভাজন আগেও ছিল এবং তা আজও আছে। বিজেপি-বিরোধী নানা দল (কেন্দ্রে বা এই রাজ্যে) এই হিন্দু ভোটের বিভাজনের এবং একই সঙ্গে মুসলমান ভোটের মোটামটি একই দিকে যাওয়ার যে প্রবণতা সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, সেই কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে সংখ্যালঘু তোষণে ব্যস্ত থাকে। এই সব দলের প্রাপ্ত ভোটের একটা বিরাট অংশই হয় সংখ্যালঘু ভোট এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে থাকে কিছু হিন্দু ভোট। ফলে বোঝাই যায় যে, সংখ্যালঘু ভোট যেহেতু নির্বাচনে একটা নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে, তাই এইসব দল (বিজেপি ব্যতীত) সর্বদাই সংখ্যালঘু তত্ত্বকে জিইয়ে রাখতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে এর সুফলও মেলে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। উদাহরণ স্বরূপ ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা বলা যায়। ২০১৪ সালে বিজেপির দুর্ধর্ষ জয়ের মূল কারণ ছিল মোদী- ম্যাজিক এবং তা মোদীঝড় হয়ে বিপক্ষ দলগুলিকে একেবারেই ধরাশায়ী করে দেয়। তার পরের পাঁচবছরের সুদক্ষ নেতৃত্ব ও সুশাসনের জন্য ২০১৯ সালে মোদী-ঝড় মোদী-সুনামিতে পরিণত হয় এবং পুনরায় ইতিহাস সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক বিহার-নির্বাচনও এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি। তবুও ভারতের স্বাধীনতা- উত্তর ইতিহাসে এবং বিশেষ করে ভারতকে সেকুলার দেশ বলে ঘোষণা করবার পর থেকেই শুরু হয়েছে নানাভাবে সংখ্যালঘু তোষণ, যা দেশ ও জাতীয় স্বার্থকে বহুক্ষেত্রেই বিঘ্নিত করেছে ও আজও করে চলেছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এই অহেতুক ও নীতিহীন সংখ্যালঘু তোষণের বিরোধিতা করে এসেছে কারণ, বিজেপি কখনই জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরিপন্থী কিছু করেনি ও করবেও না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিও চিরদিনই এই ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবল বিরোধিতা করে এসেছে। পরিণামে বিজেপি কর্মী, সমর্থক এবং এমনকী জাতীয় সর্বভারতীয় সভাপতিকেও ভয়ংকর হামলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আরএসএস ও ভিএইচপি প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। মুখে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর কথা বলে, ভারতে থেকে এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সবরকম সুযোগ-সুবিধা দারুণ ভাবে ভোগ করবার পরে যে মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ভারতকেই 'টুকরে টুকরে' করতে চায় এবং প্রকাশ্যে এই বিষয়ে স্লোগান তোলে, এই সব সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল তাদেরই সমর্থন করে। দিল্লির শাহিনবাগের আন্দোলনের কথা তো আমরা সকলেই জানি। অনৈতিক, জাতীয় নিরপেক্ষতার বিঘ্নকারী এবং সর্বোপরি শুধুমাত্র বিশেষ একটি ধর্মের স্বার্থের কথা ভেবেই এই আন্দোলন করা হয়েছিল। এরা সকলেই 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর সমর্থক। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটাই মূল্যহীন ও অবান্তর। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে সংবিধানে সেকুলার কথাটি ছিল না। এর অর্থ কি এটাই যে, স্বাধীন হওয়ার পরে হিন্দুরা মুসলমানদের ধরে ধরে মেরেছে বা অত্যাচার করেছে? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এবং স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি প্রমাণ দেয় যে, হিন্দুরা কখনও কোনও দিনই অন্য কোনও ধর্মের প্রতি এতটুকুও অত্যাচার করেনি এবং করে না। কারণ,এটাই হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু মুসলমানরা এই দেশে আসবার পরেই শুরু হয় হিন্দুদের উপরে ইসলামের অত্যাচার। এই বিষয়ে স্বামীজীর উক্তিই এখানে সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রমাণ— '...তলোয়ার ছাড়া খ্রিস্টানধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও তো? খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস মন্থন করে আমাকে একটি দৃষ্টান্ত দাও, আমি দুটি চাই না। আমি জানি... তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কী করে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর গ্রহণ, নয় মৃত্যু--- এই তো!' (৫/৪১৭-৪১৮)

স্বামীজী এই বিষয়ে আরও বলেছেন যে— 'বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না যে প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবন বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে।' (৫/২৭১)

''মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। তাহাদের মূলমন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত যে সমস্ত কেবল খারাপই নহে উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে, যে কোনো পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিঃশেষে হত্যা করিতে হইবে, যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে, যে কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত

ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।" (Complete Works, Eng. Vol-IV, P. 125-126)

স্বামীজী এই বিষয়ে আরও বলেছেন যে— 'বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না যে প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবন বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে।' (৫/২৭১)

বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা নামক তত্ত্বটিই হলো সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং সুপরিকল্পিত ভাবে হিন্দুত্বের বিনাশের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে স্বামীজীর উক্তি তো প্রচুর রয়েছে। এক্ষেত্রে তাই আরও একটি প্রাসঙ্গিক উক্তির কথা উঠে আসে— 'যদি বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস তুলনা করা যায় তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট পৃথিবী যতটা ঋণী, আর কোনো জাতিরই নিকট ততটা নহে।' (৫/৪)

একটা কথা না বললেই নয়। তা হলো এই যে, নানাভাবে এবং সুকৌশলে হিন্দুধর্মের জাগরণ যাতে না ঘটে, তার প্রচেষ্টা সারা দেশের সব অঞ্চলেই করা হয়েছে। মুখে লোকদেখানো সর্বধর্মের সাম্যের কথা বললেও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখা গিয়েছে ঠিক উল্টো ছবিই। তাই প্রকাশ্যে হিন্দুবিরোধী কথা বলা হয়, হিন্দু দেব-দেবী প্রসঙ্গে কটূক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করা হয়, হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ও রীতি-রেওয়াজ নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয় এবং সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল তথা গণমাধ্যমের একটা বিরাট অংশই মুনাফার লোভে এইসব নিন্দনীয় কাজকে প্রতিনিয়তই সমর্থন করে চলেছে। এই সবে মদতদাতা হিসেবে উঠে আসে সমাজের বিশিষ্টজন তথা বুদ্ধিজীবীদের কথাও। সামান্য স্বার্থের জন্য এই সকল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ক্রমাগত হিন্দুধর্মের নিন্দা করে হিন্দুমতাবলম্বীদের অপমান করে চলেছে। এই পরিস্থিতি কখনই ধর্মক্ষেত্রে সাম্যতার চিত্র বহন করে না। মজার ব্যাপার এই যে, অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টা কিন্তু আদৌ এমন নয়। কখনও যদি হিন্দু ছাড়া অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ যদি একটি শব্দও উচ্চারণ করে, তবে এই সকল ব্যক্তি তথা সংস্থা বা সংবাদমাধ্যম সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচার হচ্ছে বলে একেবারে হামলে পড়ে। উল্টোদিকে, মুসলমান কর্তৃক হিন্দু আক্রান্ত হলে বা হিন্দু হতাহত হলে ভারতের তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা মোমবাতি নিয়ে মিছিল তো দূরের কথা, সামান্য কিছু মন্তব্য করার প্রয়োজনও বোধ করে না, বরং এইসব ব্যাপারগুলিকে লঘু করে দেখানো বা একেবারেই না দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়। দিল্লির সাম্প্রতিক দাঙ্গা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া দেশবিরোধী নানা কার্যকলাপ, জেহাদি স্লোগান ইত্যাদি একশ্রেণীর গণমাধ্যমে যথেষ্টই লঘু করে দেখানো হয় এবং অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তো সরাসরি এইসব 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর সদস্যদের সমর্থনই করেছে। আসলে, হিন্দুজাতি এত সহিষ্ণু বলেই হিন্দুধর্মের প্রতি এত অবজ্ঞা তথা অবমাননা করা যায়। এটাই হলো ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আসল বা প্রকৃত চিত্র।

রামমন্দির আন্দোলন সারা ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেই একটি মাইলস্টোন বা ফলক হয়ে থাকবে। বাবরি-ধাঁচা ধ্বংস এবং ওই স্থলে রামমন্দিরের শিলান্যাস— এইসব নিয়ে তো বিস্তারিত আলোচনা আগের বিভিন্ন লেখায় করেছি। সুপ্রিম কোর্টের রায়েও এটা স্পষ্ট যে, রামমন্দির আন্দোলন যথার্থ এবং ওই স্থানে রামমন্দির হওয়াটাই আইনসঙ্গত। এ নিয়ে অবশ্য 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর সদস্যদের আপত্তি বা আফশোসের সীমা নেই। এই ব্যাক্তির কাছে মুসলমান আমলে ধ্বংস হওয়া হাজার হাজার হিন্দু মন্দিরের কোনো মূল্যই নেই। অন্যদিকে বহিরাগত মুঘল শাসক বাবর এই সব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একেবারে পরম আত্মীয় বলেই মনে হয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার ওই স্থানে রামমন্দির নির্মাণেরই নির্দেশ দিয়েছে এবং এই ভাবে ভারতে পুনরায় হিন্দু নবজাগরণের সূচনা হয়েছে।

এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এতটাই উদার যে, কেউ হিন্দুধর্ম বা হিন্দুসমাজের পক্ষে কিছু বললেই, সেই ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী ও নানাভাবে সংখ্যালঘুর উপরে অত্যাচারকারী বলে অভিহিত করবার প্রচেষ্টা করা হয়। এর অর্থ খুবই স্পষ্ট। হিন্দুদের সংখ্যা যতটা পারা যায়, কমিয়ে আনা। তাছাড়া, শিক্ষা, পোশাক, আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, নীতি বা আদর্শ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই সর্বদা প্রচেষ্টা করা হয় যাতে হিন্দুরা নিজেদের সনাতন আদর্শ থেকে দূরে সরে যায় ও অন্যান্য ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করে। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে কিন্তু এমনটা মোটেও করা হয় না। মাদ্রাসাগুলিতে নিয়মিতই চলে ইসলামের অনুশীলন। এর পাশাপাশি অবশ্য বহু মাদ্রাসাতেই চলে জঙ্গি দলে নাম লেখানোর কাজ বা ভারত-বিরোধী নানা কার্যকলাপ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু আল-কায়দা জঙ্গির ধরা পড়ার পরে এই বিষয়টি আরও একবার প্রকাশ্যে এসেছে। প্রশ্ন হলো যে, হিন্দুরা সহিষ্ণু বলে এই যে এত অত্যাচার, তা হিন্দুরা এখনো সহ্য করে চলেছে। কিন্তু এভাবে তো হিন্দুধর্মের ক্রমাগত অপমানই হতে থাকবে। সনাতন রীতিনীতি, বৈদিক আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার কারণেই তো দেশে নানাবিধ অপরাধ, ষড়যন্ত্র, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য পটপরিবর্তন যে শুরু হয়নি, তা মোটেই নয়। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদী সরকার আসবার পর থেকেই এই দীর্ঘ ছয় বছরে হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য সিএএ প্রণয়নও করা হয়েছে। তবে অবশ্যই এই আইন মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জন্য নয়। বিজেপি মুসলমান বিরোধী নয়, তবে অনুপ্রবেশকারীদের অবশ্যই বিরোধী। জাতীয় স্বার্থে বিজেপি এই ভোট-সর্বস্ব ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ বিরোধী।

সীমিত পরিসরে এত বিস্তৃত একটি বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবু কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করা হলো। হিন্দু সমাজ থেকে সংবিধান সংশোধনের যে দাবি বহুদিন ধরেই চলে আসছে, তা ন্যায়সঙ্গত এবং কেন্দ্র সরকারের উচিত তা নিয়ে বিচার করা। পাশাপাশি হিন্দু সমাজকেও ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার এবং নিজেদের স্বার্থে নিজেদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে, হিন্দুত্ববাদী হয়ে চলা দরকার। ধর্মবর্জিত হলেই হিন্দুজাতি একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যাবে— এটা বোঝা দরকার। তাই প্রয়োজন হিন্দুধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক নতুন ভারত— তবেই আবার এই দেশের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ সম্ভব। ভারত বিশ্বের দরবারে হিন্দুধর্মের গৈরিক পতাকা নিয়ে আরও একবার শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করবে— এটাই কাম্য।

অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নতুন ভারত জেগে উঠছে

অশোক মালিক

অগ্নিপথের মধ্যে দিয়ে ভারত দীপ্তিমান পুরুষের মতো এগিয়ে আসছে। এই সময় পূর্বে নেওয়া সব প্রকল্পই যে সফল হবে তা নাও হতে পারে ,তবে অনেকগুলি এখনই সফলতার মুখ দেখছে। ভারত এই মহামারীর বলয় থেকে শক্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। সে আজ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এই সমাপ্ত হতে যাওয়া বছরটির অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে দেশ নতুন আত্মবিশ্বাস, প্রতিজ্ঞা ও স্থির লক্ষ্যের পথে অবিচল এগিয়ে যাবে। ইতিহাস তার গতিপথে মানুষের যাত্রা নির্দিষ্ট করে রাখে। কিন্তু ২০২০ সালটিতে ইতিহাসও হয়তো তার যাত্রাপথ নিয়ে সন্দিহান ছিল। ভারতের জন্য বছরটিতে বহুবিধ কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষমান ছিল। কোভিড সংক্রমণ ও মহামারী সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ধসের মধ্যে ঘটেছিল লাদাখে শতাব্দীর সর্ববৃহৎ চীনা সামরিক মোতয়েন। এই দুটি অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য এসেছিল স্মরণাতীত কালের এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। এই সূত্রে যদি কাউকে স্বাধীনোত্তর ভারতের ৫টি সর্বাপেক্ষা কঠিনতম বছরের তালিকা তৈরি করতে হয় সেখানে ২০২০ একেবারে সামনে থাকবে। অন্যদের মধ্যে—(১) ১৯৬২ সালের চীন যুদ্ধ এবং জাতির ওপর তার সামগ্রিক প্রভাব, (২) ১৯৬৬-র পাকিস্তান যুদ্ধের পরেই হঠাৎ ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু এবং দেশে খাদ্যাভাব ও বিহারে খরার ভয়াবহতা, (৩) ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি এবং দেশের উত্তাল পরিস্থিতি, (৪) ইন্দিরা গান্ধী হত্যার প্রেক্ষিতে শিখরক্তে রঞ্জিত ১৯৮৪। এই ৪টি বছর আকস্মিক ঘটনার অভিঘাত, দেশব্যাপী ব্যাপ্তি ও জাতীয় জীবনকে নাড়া দেওয়ার মতো ক্ষমতাবান হলেও ২০২০-র পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত খামখেয়ালি জীবাণু যে সদা স্থান পরিবর্তনকারী তাকে বাগে আনতে পৃথিবীর কোনো দেশই সবকিছু ঠিকঠাক করতে পেরেছে একথা বলা যাবে না। ভারত অন্যান্যদের থেকে একে অনেক কড়া হাতে ও সফলভাবে সামলেছে। এবং সামগ্রিক বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রশংসনীয় উদাহরণ তুলে ধরেছে।

ভারতের সমগ্র জনগণের হিতার্থে কাজ করার প্রতিজ্ঞার পেছনে স্থির রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচালনা যোগ হওয়ায় পরিস্থিতি দমন করতে সুবিধে হয়েছিল। এর সঙ্গে যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা কিছুটা মজবুত ছিল সেখানে মোকাবিলা হয়েছিল দৃঢ় । ফল হয়েছে আশাতীত। এত দ্রুত বহু রাজ্যে পরিকাঠামো তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল যা শুরুর মার্চ মাসে ছিল অভাবনীয়। এত মৃত্যুর মধ্যে এই মহামারী প্রমাণ করেছিল ভারতের সংকল্প ও আত্মনিয়ন্ত্রণ কী ম্যাজিক দেখাতে পারে। সরকারের ওপর মানুষের আস্থা ও বিপদকে সামলানোর ক্ষেত্রে সরকারের সামনে এসে লড়াই করার উদাহরণ দেশবাসীর মধ্যে আশ্চর্য কঠিন এক মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল যে তারা পারবেই।

ভারতীয় সমাজের কাঠিন্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বিপদের মুখোমুখি সময়ে যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এরই সমান্তরালভাবে গালওয়ানের ও লাদাখের অন্য সীমান্ত অঞ্চলে বিস্তীর্ণ চীনা সৈন্য সমাবেশের মুখে ভারতের অপ্রতিরোধ্য সেনা এক পাও পিছিয়ে আসেনি। চোখে চোখ রেখে শত্রুকে সমঝে দিয়েছে তাদের ইস্পাত কঠিন মানসিকতা যা সবটুকু দিতে সংকল্পবদ্ধ। হিমালয়ের হিমশীতল পর্বতমালার উচ্চতা অতিক্রম করে এই অসীম সাহসিকতা যেন বলেছিল, 'আমরা রক্তাক্ত হতে পারি কিন্তু এই পাহাড়পুঞ্জের মতোই অবনত হতে শিখিনি।'

অন্য একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, ২০২০ সালে পৌঁছে তবেই বিশ্ববাসীর কাছে ৯০-এর দশক যাকে বলে তা যেন পাকাপাকিভাবে শেষ হলো। এই শেষের শুরু হয়েছিল ১৯৮৯-এর নভেম্বরে বার্লিন প্রাচীর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গেই সূচনা হয়েছিল বিশ্বব্যাপী সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও অর্থনীতির অগ্রগতির। দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে একপক্ষীয় আধিপত্যের সঙ্গে বহুত্বের অস্তিত্বও কিন্তু শুরু হতে লাগল। একটানা শোক পালন

করতে বিশ্ব বাধ্য হলো ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের আমেরিকায় জঙ্গি হানা, একই বছরের ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদে দুঃসাহসিক আক্রমণ। বিশ্বের নানা প্রান্তে ইসলামি জিহাদের যে আক্রমণ দেখা যাচ্ছে তার তীব্রতা উল্লেখিত ২টির থেকে কম। কিন্তু এর অভিঘাতে আজকের বিশ্বে যে রাষ্ট্র পরিচালন নীতির প্রচলন ঘটেছে তা মূলত সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সংঘাতপূর্ণ পথে অগ্রগমনকেই বেছে নিয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিছুতেই একমত হয়ে ঘোষণা করতে পারেনি যে 'করোনা ভাইরাসের' আক্রমণ একটি বিশ্বব্যাপী মহামারী এবং বিশ্বমানবের জীবন-জীবিকার পক্ষে আতঙ্কজনক। বহুদেশীয় উপস্থিতির এক বিচিত্র কাঠামো কিন্তু উপযুক্তভাবে তার উপস্থিতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারল না। বহুদেশীয় হয়েও রাষ্ট্রসঙ্ঘ চীনের চাপ মানতে বাধ্য হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর চলতি দশকে বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে একেবারে খোলামেলা বাণিজ্যচুক্তি করার আগে প্রত্যেকটি দেশ তার নিজস্ব বাস্তবতা খরচ ও বিক্রীত মূল্যের মধ্যে ইতিবাচক ব্যবধান থাকলে তবেই রাজি হয়েছে। একটি সকলের জন্য সমান বিশ্ববাণিজ্যের ধাঁচায় কাজ করতে চেয়েছে। একচেটিয়া রপ্তানি বা একপেশে আমদানি নয়। করোনা মহামারীর প্রাথমিক মাসগুলিতে মাস্ক, পিপিই, ভেন্টিলেটর কেনা-বেচা নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছে।

বিশ্ববাণিজ্য ও দেশগুলির বাণিজ্য ঘাটতির বিষয় মাথায় রেখে কাজ করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল দেশের সাধারণ মানুষও এসব বিষয় নিয়ে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত দেশ তাকে অস্বীকারও করতে পারে না। Ragional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) থেকে ভারতের বেরিয়ে আসা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। সহজ উদাহরণ দিয়ে বললে বোঝা যাবে অস্ট্রেলিয়ার পর্যাপ্ত দুগ্ধজাত পণ্য ভারতে পৌঁছলে ভারতের বিশাল মানুষের কর্ম সংস্থানকারী 'আমুলের' উৎপাদন সমূহ বিপদের মুখে পড়ে যেত। সমবায় ভিত্তিতে তৈরি এই সংস্থা বিশ্বের কাছে আজ এক নিদর্শন। এমন নজির আরও আছে যেখানে ভারত অনেক এগিয়ে অথচ আরসিইএফ-এ থাকলে তাকে আমদানি করতেই হতো। তাই ২০২০ সালের পর Free Trade Agrement হয়তো fessible tade agreement-এ রূপায়িত হবে। অর্থাৎ যা খুশি আমদানি রপ্তানি নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পক্ষে হিতকর নীতিই অনুসৃত হবে। এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নয়।

আজকের পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নতুন করে দেশের কৌশলগত ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। ভারতে শিল্পনীতি বিশ্বের সঙ্গে দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ কেমন হবে সেকথা মাথায় রেখেই এমন ঠিক করা হচ্ছে। দেশে ও বিদেশের বহু দেশের সরকার ও উদ্যোগপতিরা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছেন। যারা শ্লথ গতিতে চলছেন তাঁরা সেই ৯০-এর দশকের বদ্ধ ঘরেই পড়ে আছেন। সেই ঘোলাটে দৃষ্টিতে ২০২০-র দিকে তাকালে তা বাণিজ্যিকভাবে আত্মবলিদানেরই শামিল। দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু দেশ এটা করেছে। ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো কোভিড মোকাবিলায় বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। ডিজিটাল কলাকৌশলের সফল প্রয়োগের ফলে সরবরাহ ও পরিষেবা ক্ষেত্রে দেশের কুশলতা বড়ো প্রমাণ রেখেছে। দেশে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেছে অবিশ্বাস্যভাবে। ২০২০-র শুরুতে যে দেশে চিকিৎসা সরঞ্জামের বড়োসড়ো ঘাটতি ছিল। ক'মাসের মধ্যে দেশে ১০০টি কোম্পানি পিপিই তৈরি করছে। ভেন্টিলেটর তৈরি করেছে ৫০টি কোম্পানি। এন-৯৫ মাস্ক উৎপাদন করার পর দেশ তা ব্যাপক রপ্তানি করছে। এই যে বিপুল উৎপাদনমুখীনতা একে সঠিকভাবে দেশের পরিচর্যা করা দরকার। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও স্টার্টআপের বিশাল বিদেশি বিনিয়োগ আনা ডিজিটাল শিক্ষা থেকে ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে তা ভারতের নিজস্ব প্রচেষ্টাকেই সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। একইভাবে সরকারের তরফে এমএসএমই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সীমা বাড়ানো ও উৎপানের সঙ্গে যুক্ত ইনসেন্টিভ দেওয়ার ফলে ঘরোয়া উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ স্মার্ট ফোনের কথা বলা যায়। এগুলি সবই করোনা আমলে নেওয়া এক সাহসী পদক্ষেপ যা ফলদায়ী হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রেও ব্যাপক সংস্কারে হাত দেওয়া হয়েছে যা কায়েমি স্বার্থ বরাবর এড়িয়ে গেছে।

২০২০-র এই শেষ লগ্নে অগ্নিপথের মধ্যে দিয়ে ভারত দীপ্তিমান পুরুষের মতো এগিয়ে আসছে। এই সময় পূর্বে নেওয়া সব প্রকল্পই যে সফল হবে তা নাও হতে পারে ,তবে অনেকগুলি এখনই সফলতার মুখ দেখছে। ভারত এই মহামারীর বলয় থেকে শক্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। সে আজ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(লেখক ভারত সরকারের বিদেশ বিভাগীয় নীতি উপদেষ্টা)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

SURYA

MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES

AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | **Toll Free No.: 1800 102 5657**